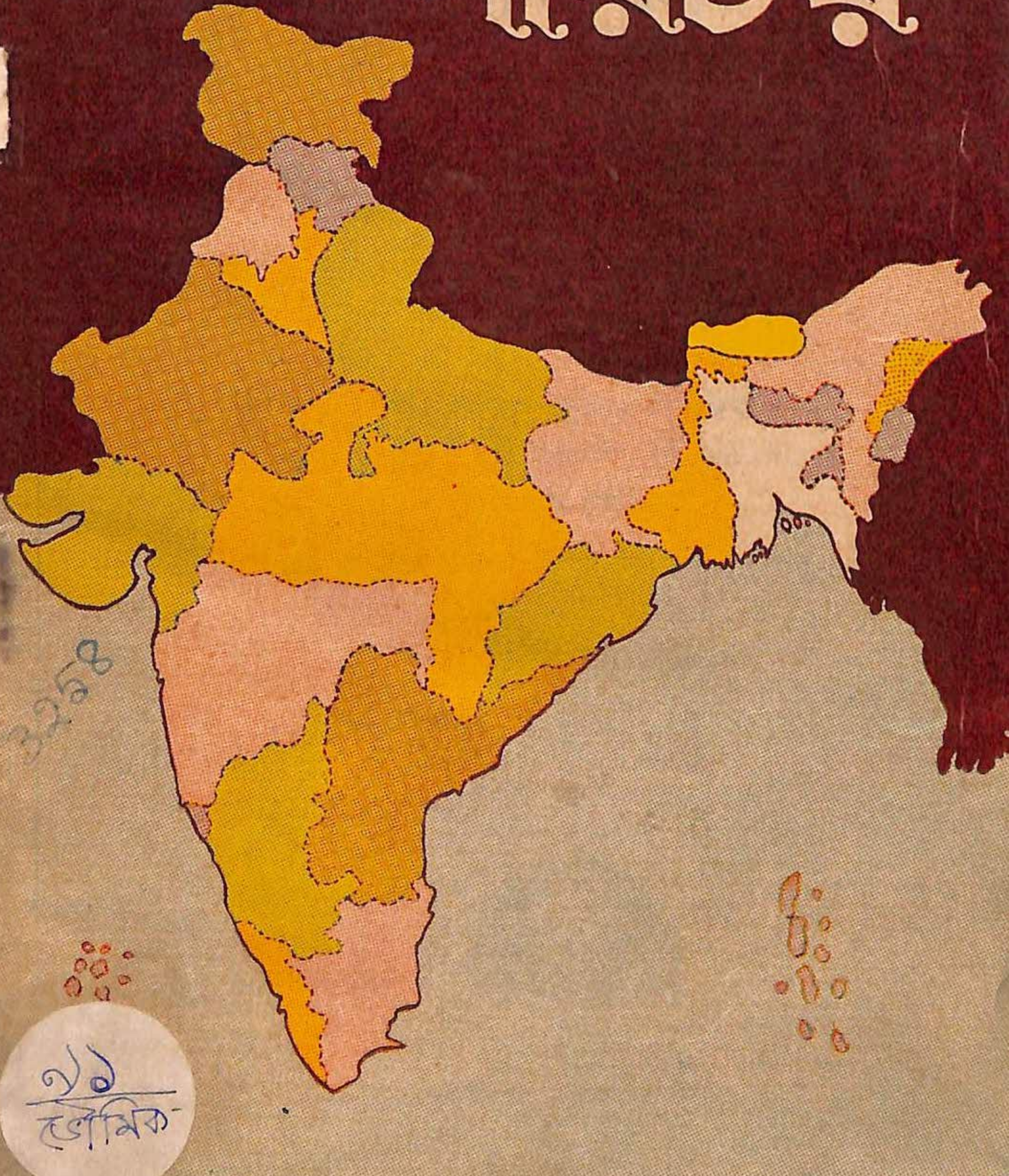
ভূগোল পরিচয়



পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত।

(বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১০০১৫/জি., তারিখ—১৮-৭-৭৩)

ভূগোল পরিচয়

(নবম শ্রেণীর পাঠ্য)

ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক,
এম. এস. সি., পি. এইচ. ডি., ডি. এস. সি.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ শ্রীমতী চম্পা মিত্র, এম. এ., পি. এইচ. ডি.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নিউ মডার্ন বুক স্টোর

প্রাপ্তিস্থান :
নিউ মডার্ন বুক স্টোর
৬৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

. P.K. Bhowmik
127, Lake Town.
Cal-55
Phone 57-4197

প্রকাশক :
স্বপন চৌধুরী
নিউ মডার্ন বুক স্টোর
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর, ১৯৭৩

মূল্য—তিন টাকা আশি পয়সা

মুদ্রক :
শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০, রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলিকাতা-৬

বিষয় সূচী

Syllabus in Geography for Class IX

(100 pages including illustrations, diagrams, charts, photographs. etc) Size Double Demy (1/16) and type Small pica.

1. 1. Meaning of the Geographical regions with particular reference to India. (4 pages)
2. Account of the undernoted major Geographical regions of India
   (a) The Himalayas (b) The Ganga Plains (Upper, Middle and Lower with emphasis on the lower Ganga plains —i.e. West Bengal).
   (c) The desert. (d) Kutch and Kathiawar Peninsula.
   (e) The Deccan Plateau—including the Lava Region, Mysore Plateau & Chotonagpur Plateau.
   (f) Eastern Coastal Plains (including the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Cauvery).
   (g) Western Coastal Plains,
   (h) The Brahmaputra Valley.
   (i) Hilly States of N. E. India (Meghalaya, Nagaland, Manipur and Tripura).

A brief account of the major elements of Physical Geography should be integrated with the descriptions of the aforesaid regions. In the study of the above-mentioned regions emphasis should be laid on the influence of the physical environment on human life and activities with an integrated approach.

OF EDUCATION FOR
Dept. of Extension
SERVICES
CALCUTTA

১ আমাদের দেশ

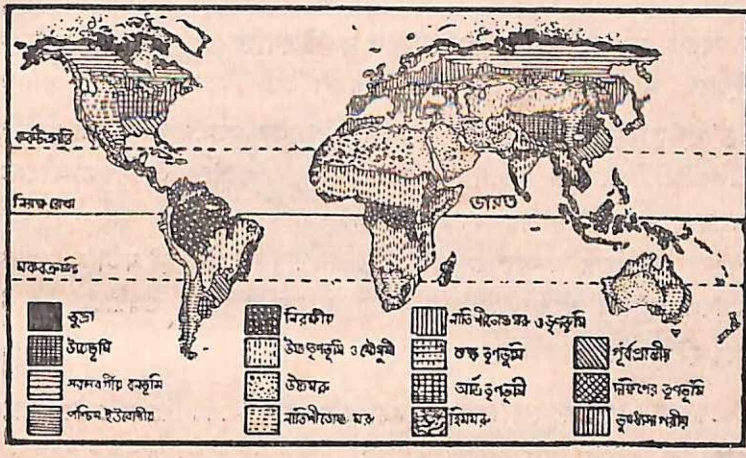
আমাদের এই পৃথিবী বিচিত্র। ইহার প্রায় তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। সেই স্থলভাগে আমরা কত না বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। কেননা ইহার কোন অঞ্চল বৎসরের সারা সময় তুষারে ঢাকা আবার অন্য অঞ্চলে গ্রীষ্মের আধিক্য—হয়তো বা বালুকারাশিতে পূর্ণ। কোথাও বা দীর্ঘস্থায়ী চিরহরিৎ অরণ্য—কোথাও বা তৃণ-গুল্ম। কোথাও নদ-নদী আবার কোথাও বা পাহাড়-পর্বত। মানুষ পৃথিবীর এই সকল নানা বৈচিত্র্যময় পরিবেশের সংগে নানাভাবে অভিযোজন (adaptation) করিতে সমর্থ হইয়াছে—ফলে প্রকৃতি, পরিবেশ বা পরিমণ্ডলের প্রভাবে তাহার জীবনযাত্রাও ভিন্ন হইয়াছে। মানুষ তাহার প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল সুতরাং প্রকৃতি পরিবেশের সহিত **অভিযোজনের** জন্য মানুষের জীবনযাত্রা বা **সাংস্কৃতিক রূপরেণু** (cultural trait) এত ভিন্ন হয়। ভূগোলের সাহায্যে আমরা প্রকৃতি-পরিবেশ সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারি। ধরাপৃষ্ঠের গঠন-বৈচিত্র্যের জন্য কোন এক অঞ্চলের অবস্থানের জলবায়ু ভিন্ন হয়। এই জলবায়ুর প্রভাবে তথাকার উদ্ভিদ জগৎ বা জীবজন্তুর প্রকার পৃথক হয়। মানুষকে সে সবের সংগে খাপ খাওয়াইয়া তাহার প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইতে হয়—ফলে তাহার বস্তুকেন্দ্রিক ব্যবহারিক সাংস্কৃতিক (material culture) রূপরেণুর হেরফের হয়। এই বিভিন্নতার জন্য আমরা নিজদিগকে অনেক সময় ভিন্ন সংস্কৃতির লোক বা গোষ্ঠী বলিয়া এক আপাত বৈষম্যের ব্যবধান রেখা টানিয়া লই। বস্তুতপক্ষে ভৌগোলিক-পরিচিতি মানুষের কাছে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের বা সংস্কৃতিগত বৈষম্যের এক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারিবে—মানুষে মানুষে

ব্যবহারিক জীবনের তফাৎ বুঝাইতে সক্ষম হইবে। ভৌগোলিক-পরিচিতি আমাদিগকে পরিবেশ পরিমণ্ডল সম্পর্কে সচেতন হইতে সাহায্য করিবে। ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ তাহার প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান পাইবে ও সে সকলের সু-ব্যবহারে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনাকে সার্থক করিবে। আর পরিশেষে অন্যান্য উন্নততর জীবনযাত্রায় উৎসাহী হইয়া বস্তুকেন্দ্রিক ব্যবহারিক সংস্কৃতির বিশেষ উন্নতি সাধনে যত্নবান হইবে। সেইজন্য বহু দেশ নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাইয়া দেশের সমৃদ্ধি রচনায় উৎসাহী হইতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞান, আমাদের দেশের ভৌগোলিক পরিচয় আমাদিগকে দেশকে ঠিকমত চিনিতে, ইহার ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারাকে ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে বা এই দেশের সম্পদ সম্ভারকে উপযুক্তভাবে কার্যকরী করিয়া দেশকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিতে সাহায্য করিবে।

ভারত : ভারতবর্ষ : হিন্দুস্তান : ভারত যুক্তরাষ্ট্র

ভারত আমাদের জন্মভূমি; পৃথিবীর অতি প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক পীঠস্থান। অনেকের মতে পুরাণ বর্ণিত ভরত রাজার নাম অনুসারে **ভারত** নাম হইয়াছে। এর অবস্থান, এর প্রাকৃতিক সম্পদ, এর অধিবাসীদের সভ্যতা ও জনজীবনের সংস্কৃতির গরিমা যুগ যুগ ধরিয়া অনেককে আকৃষ্ট করিয়াছিল, এই ভূখণ্ডে আসিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—কেহ বা দস্যু-তস্কর বা আক্রমণকারী হিসাবে, কেহ বা ব্যবসায়ী বেশে, কেহ বা জ্ঞান আহরণের জন্য। ইরানীরা সিন্ধু (Indus)-র অপর পারকে 'ইণ্ডিস' বলিত। যাহা কালক্রমে **হিন্দুস্তান** (India) রূপে পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের মধ্য দিয়া এই অখণ্ড ভারত বা **হিন্দুস্তান** এক বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপক হিসাবে পরিগণিত হইল। অনেকে এই পার্থক্যের জন্য ভারতকে একটি **ক্ষুদ্র পৃথিবী** (epitome of the world) বা **উপমহাদেশ** (sub-continent) বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। মানসিকতায়, জীবনযাত্রায়, জীবনের মূল্যবোধে ও অপর মানুষকে বুঝিবার মধ্য দিয়া সেই শাশ্বত ভারত বাণী নানাভাবে মূর্ত হইয়াছে—নানাভাবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে —তাই আমরা **ভারতবাসী, ভারত** আমাদের **জন্মভূমি**। রাজনৈতিক কারণে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত

হইয়াছে—বৃটিশ অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গণতান্ত্রিক সার্বভৌম স্বাধীন ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করিয়াছে।



ভারতের অবস্থান

পূর্বগোলার্ধের কেন্দ্রস্থলে মধ্য এশিয়ার দক্ষিণে ভারতের অবস্থিতি। উত্তরে হিমালয় পর্বতের গা ঘেঁষিয়া উত্তর এশিয়ার বিস্তৃত অংশ, দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত মহাসাগরের পারের মহাদেশ **আফ্রিকা,** আর দক্ষিণ-পূর্বে ভারত মহাসাগরের পূর্বদিকে **ওশিয়ানিয়া**। সেইজন্য বিভিন্ন মহাদেশের সংগে নানাভাবে যোগসাধন সম্ভব। এদেশের উত্তর সীমায় রহিয়াছে পৃথিবীর বৃহত্তম পর্বত হিমালয়; তাহার উত্তরে রহিয়াছে তিব্বত ও চীন। পূর্বদিকে বাংলাদেশ ও ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর আর পশ্চিমে আরব মহাসাগর। উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান, পাকিস্তান।

মোট আয়তন * প্রায় ১১$\frac{১}{২}$ লক্ষ বর্গমাইল। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় ৩%। ১৯৭১ খৃস্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে মোট লোকসংখ্যা ৫৪৭৯৪৯৮০৯। **দিল্লি** ভারতের রাজধানী। ভারতের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্বদিক স্থলদ্বারা বেষ্টিত আর পশ্চিম-দক্ষিণ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে

---

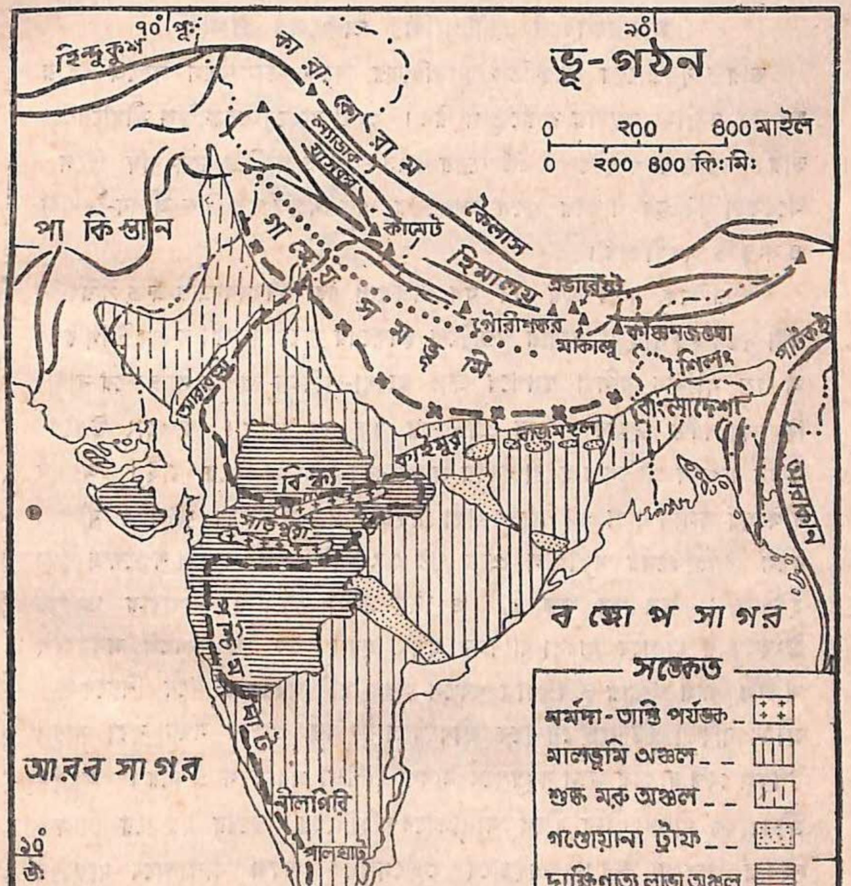
* এই আয়তন বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ১০ গুণ ও জাপানের ৮ গুণ বড়, কানাডা বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ।

রহিয়াছে জল। যদিও এই সীমারেখা ভারতকে নানাভাবে রক্ষা করিয়াছে তবুও উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য গিরিপথ কিংবা দক্ষিণের বা দক্ষিণ-পশ্চিমের সমুদ্রপথে বিদেশীয়দের আগমন সম্ভব হইয়াছিল।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়া কল্পিত **কর্কটক্রান্তি** রেখা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে আর ঠিক মধ্যভাগ দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে কল্পিত ৮২½° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা। ফলে দক্ষিণ অর্ধাংশ উষ্ণমণ্ডলে, আর উত্তর অর্ধাংশ উর্ধ্বতর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। এসবের প্রভাবে ঐ সকল অঞ্চলের জলবায়ু, উৎপন্ন দ্রব্যাদির বৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব ও পশ্চিমের দ্রাঘিমার তফাতের জন্য সময়ের পার্থক্য প্রায় দুই ঘণ্টা। অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলে আসামে সূর্যোদয় সকাল ৬টায় হইলে পশ্চিমের গুজরাটে ঠিক ঐ সময়ে হইবে ভোর রাত ৪টা।

যে-কোন দেশকে সাধারণত আমরা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক **অঞ্চল** বা মণ্ডলে ভাগ করিয়া থাকি। যদিও এই অঞ্চল বা মণ্ডল বুঝাইতে কী সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হইবে তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মতভেদ রহিয়াছে। তবুও মোটামুটি ভাবে তাঁহারা **ভুপ্রকৃতি** (land-form)-কে প্রথম গুরুত্ব দিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া **জলবায়ু** (climate) বা **অবস্থান** (position)-কে উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। অনেকের মতে ভারত উপমহাদেশের ক্ষেত্রে এক সাধারণ সংজ্ঞা নির্দেশ করা অনেকটা অসম্ভব। এই ভূখণ্ডের কোন কোন অঞ্চলের গঠন সাদৃশ্য, জলবায়ুর প্রভাব জন-জীবনের মধ্যে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। আহারের উপাদান ও ধরন, ঘরদোর বাঁধার রীতি সব কিছুরই মাধ্যমে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ ও ব্যবহারিক দিনচর্যায় সেই বৈষম্য সুস্পষ্ট হয় বলিয়া আমরা সেই সেই অংশকে এক একটি **অঞ্চল** বা **মণ্ডল** বলি। সেই কারণে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে বেশ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ **অঞ্চলে** বা **মণ্ডলে** ভাগ করা যাইতে পারে। মোটামুটিভাবে ভারতের গঠন-বৈচিত্র্যের জন্য তাহাকে প্রধানত **হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, গাঙ্গেয় সমভূমি, শুষ্ক ও মরু অঞ্চল, মালভূমি অঞ্চল, কচ্ছ কাথিয়াড়, পূর্ব-উপকূলীয় সমভূমি, পশ্চিম-উপকূলীয় সমভূমি, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য রাজ্য** প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যদিও বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালার এক অংশের সহিত

অন্য অংশের প্রভেদ বিদ্যমান। ঠিক তেমনিভাবে গাঙ্গেয় সমভূমিকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যাইতে পারে। ঐ তিনটি অঞ্চলের ভূ-গঠন ও



ভারতের ভূ-গঠন

মানুষের জীবনযাত্রার ধরনও লক্ষণীয়। মালভূমি অঞ্চলেরও ঠিক তেমনি কয়েকটি উপ-অঞ্চল রহিয়াছে। ঐ উপ-অঞ্চলের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য সহজে দেখিতে পাওয়া যায়। এইভাবে প্রধান অঞ্চল বা মণ্ডলগুলিকে আমরা

কয়েকটি উপ-অঞ্চলে ভাগ করিতে পারি। সেগুলির বৈশিষ্ট্য নানাভাবে অতি সহজে আমাদের নজরে পড়ে।

মানবজীবনে ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রভাব

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে তাকাইলে সহজে ইহার অবস্থান ও সীমা অনুমান করিতে পারিব। দেখা যাইবে প্রাকৃতিক সীমারেখায় ভারত অন্যান্য দেশ হইতে (বর্তমানের বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে বাদ দিলে) অনেকটা বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে ভারতের এক নিজস্ব সামগ্রিক জীবন-বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি অনস্বীকার্য।

অপরদিকে বহিঃশত্রুর ঘন ঘন আক্রমণে এর জীবনযাত্রায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটা সম্ভব হয় নাই। আবার অন্যদিকে স্থলপথের সংযোগকারী দু-একটি গিরিপথ অত্যন্ত সীমিত বলিয়া স্থলপথে দ্রুত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে নাই। হিমালয় পর্বত উত্তরে দুর্লংঘ্য প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান। সুতরাং উত্তরের শীতল বাতাস প্রতিহত হইয়া ইহার জনজীবনকে আড়ষ্ট করে নাই। আবার দক্ষিণের জলীয় বাষ্প এই পর্বতে বাধা পাইয়া যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে উত্তরাঞ্চলের নদীগুলি প্রায় পুষ্ট এবং নদীর তীরে শ্যামল শস্যক্ষেত্র সম্ভব হইয়াছে। জলবায়ুর জন্য কৃষি ও শিল্প-ব্যবস্থা সম্ভব হয়—আবার তাহার উৎকর্ষতার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য সুগম হয়। শুষ্ক মরু অঞ্চলে জনবসতি অত্যন্ত বিরল আবার কৃষিপ্রধান অঞ্চলে অথবা খনি অঞ্চলে যেখানে শিল্পকেন্দ্রিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে জীবনযাত্রায় অন্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উপকূল বেশী থাকার ফলে সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। আদিম জীবনাবদ্ধ মানুষ ধীরে ধীরে নানাভাবে বহির্বিশ্বের মানুষের দরবারে মিলিত হইবার সুযোগ পায়। এইভাবে ভৌগোলিক অঞ্চল নানাভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবান্বিত করে।

অনুশীলনী

১। ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি বুঝাইয়া বল।
২। ভারতের অবস্থান কোথায়? ভারতের সীমা নির্দেশ কর।
৩। হিমালয় পর্বতমালার অবস্থানের জন্য ভারতের কি হইয়াছে?
৪। ভারত নাম হইয়াছে কেন?
৫। কিভাবে অঞ্চল বা মণ্ডল ভাগ করা যাইতে পারে?
৬। মানবজীবনে ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রভাব বর্ণনা কর।

২ হিমালয় পর্বতমালা

জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তরে পামির মালভূমি হইতে দক্ষিণ-পূর্বে বাঁকিয়া **হিমালয়** পর্বতমালা বিস্তৃত হইয়াছে। এই হিমালয় পর্বতমালা প্রধানত পাললিক শিলাদ্বারা গঠিত **ভঙ্গিল** পর্বত। পামির হইল পৃথিবীর বৃহত্তম মালভূমি ও পর্বতগ্রন্থি। সেই পামির মালভূমি হইতে এই পর্বতমালা সোজা আসামের পূর্ব সীমা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং ভারতের এক সুউচ্চ প্রাচীরের মত উত্তর দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০০ কিলোমিটার বা ১৫০০ মাইল। কাশ্মীরের নিকট হিমালয়ের প্রস্থের বিস্তৃতি প্রায় ৪৮৩ কিলোমিটার বা ৩০০ মাইল। সমগ্র হিমালয় পর্বতমালা এক বিশিষ্ট অঞ্চল বা মণ্ডল। এই বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকায় তাহাকে কয়েকটি উপ-অঞ্চল বা মণ্ডলে ভাগ করা যাইতে পারে।

পামির মালভূমি হইতে উত্তরপ্রদেশের পূর্বসীমা পর্যন্ত অংশকে **পশ্চিম হিমালয়।** এই পশ্চিম হিমালয়ের সমান্তরালভাবে তিনটি পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত রহিয়াছে। উত্তরের পর্বতশ্রেণীকে **প্রধান হিমালয়** বা **অন্তঃহিমালয়** (Inner Himalays) বলিয়া অভিহিত করা যায়। ইহার উচ্চতা ২০,০০০ ফুট বা ৬০৯৮ মিটার। **জাস্কর** এই অঞ্চলের অন্তর্গত। মধ্যভাগের সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর নাম হইল **মধ্যহিমালয়** যাহার উচ্চতা ৬০০০ হইতে ১৫০০০ ফুট (১৮২৯-৪৫৭৩ মিটার) পর্যন্ত। পীর পনজল পর্বত এই অঞ্চলে। এই অঞ্চলের শহরগুলির মধ্যে **মুসৌরি, লান্স-ডাউন** প্রসিদ্ধ। শীতকালে ঐ অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। সকলের দক্ষিণের পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা ২০০০ ফুট হইতে ৫০০০ ফুটের

(৬১০-১৫২৫ মিটার) মধ্যে। তাহাকে **বহির্হিমালয়** (Outer Himalayas) বা **অবহিমালয়** (Sub-Himalayas) বলা হয়। এই অঞ্চলের পর্বতশ্রেণীর মধ্যে **শিবালিক** পর্বত হইল প্রধান। আর যে বিস্তৃত উপত্যকা তাহার পশ্চিম অংশের নাম **ডুন** আর পূর্ব অংশের নাম **মারে**। পশ্চিম অংশে দেরাডুন শহর অবস্থিত। নেপাল হইতে আসাম পর্যন্ত অঞ্চল **পূর্ব হিমালয়**। পশ্চিম হিমালয়ের সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর মত ইহাকে সরাসরি তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে না। প্রধান হিমালয় এবং অবহিমালয়ের মধ্য অংশ প্রধান হিমালয়ের সাথে মিশিয়া গিয়াছে আর এই প্রধান হিমালয়ে রহিয়াছে পৃথিবীর বৃহত্তম শৃংগ এভারেস্ট (২৯০২৯ ফুট বা ৮৮৪৮ মিটার)। অন্যান্য উচ্চ পর্বত শৃংগগুলি এই পূর্ব হিমালয়ের প্রধান হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত। যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮১০০ ফুট বা ৮৫৬৭ মিটার), মাকালু (২৭৮০০ ফুট বা ৮৪৭৫ মিটার), ধবলগিরি (২৬৮০০ ফুট বা ৮১৭০ মিটার)। অবহিমালয়ের নিম্নপ্রান্ত গভীর অরণ্যে আচ্ছন্ন তাহাকে **ডুয়ার্স** বা **তরাই** বলা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমায় আর একটি পর্বত গ্রন্থি আছে তাহার প্রধান শৃংগ **নামচা বাড়োয়া** (২৫,৫০০ ফুট বা ৭৭৭৪ মিটার)। ঐ পর্বত হইতে আসামের পূর্বদিকে ধীরে ধীরে দক্ষিণদিকে **পাটকই, নাগা, লুসাই** প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে—আর আসামের মধ্যভাগে অন্যান্য যে সকল পাহাড় আছে সেগুলির মধ্যে **গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া** হইল প্রধান।

তুষারাবৃত হিমালয় দুর্লংঘ্য প্রাচীরের মত অবাধ যাতায়াতের এক বিরাট বাধা। কিন্তু 'নগাধিরাজ হিমালয়' কেবল ভারতীয় সংস্কৃতি বা সাহিত্যে নয়, কেবলমাত্র ভারতবাসীর কাছে নয়, বহির্বিশ্বের মানুষের মনোরাজ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। একদিকে পবিত্র গঙ্গা-জাহ্নবীর উৎপত্তি স্থান, আবার অন্যদিকে কৈলাশ পর্বতে হরপার্বতীর মিলন স্থান। পর্বতদুহিতা হিম-নন্দিনী উমার ক্রীড়াভূমি এই হিমালয়ের পর্বতময় শিখরদেশ। চৈনিক তীর্থযাত্রীর চির পবিত্র স্থান বুদ্ধের জন্মভূমি হিমালয়ের পাদদেশে। আবার সুউচ্চ হিমালয়ের তিনদিকে পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্মমত : পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকায় ইসলামের প্রতিধ্বনি, অব-হিমালয় প্রান্তে হিন্দুধর্মের ছন্দিত মন্ত্র, আর উত্তরে লাডাক-তিব্বত-চীনে মহাযান বুদ্ধের অমরবাণী। হিমালয় হইতেছে সে সবের কেন্দ্রবিন্দু। অন্যদিকে আর্যাবর্তের পথ পরিক্রমায় শ্যামল শস্য রচনা করিয়া ভাগীরথী-গঙ্গা সীমাহীন সাগরে বিলীয়মানা—সহস্র সহস্র মানুষকে

জীবনের জয়গানে জীবন্ত-উদ্বেলিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। এই হিমালয় কেবল প্রাকৃতিক মাধুর্যে নহে, মোক্ষ মুক্তির সন্ধানে নহে—কেমন এক



পুরাণে বর্ণিত ভগীরথ হিমালয় হইতে গঙ্গা আনিতেছেন

অকৃত্রিম আকর্ষণ দিয়া বহুজনকে এক সংগে গ্রথিত করিয়াছে—বহু মানুষের প্রার্থনামন্ত্রে-সংগীতে তাহা ঝংকৃত।

সিন্ধু-কোশিস্তান এবং গিলগিট্

হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমের বৃহত্তর শৃংগ হইল **নাঙ্গা** (২৬,৬০০ ফুট)। ইহা হিমালয়ের অন্যান্য অংশ কিষণ গংগা ও আস্টর অঞ্চল হইতে পৃথক। ইহার মধ্য দিয়া বারজিল গিরিপথ রহিয়াছে। ইহার উত্তর ও পূর্বে সিন্ধুর কয়েকটি গভীর খাঁড়ি রহিয়াছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের গঠন বৈচিত্র্যের উপাদান হিমালয়ের অন্য অংশ হইতে পৃথক। উচ্চ পর্বতশৃংগ হইতে প্রায় ১০০ বর্গমাইল তুষার নদী। প্রায় ১৫০০ হাজার-১৭০০০ হাজার ফুট উচ্চের খাঁড়ি হইতে সিন্ধু প্রবাহিত হইতেছে এবং ইহার বিস্তার প্রায় ১২ হইতে ১৬ মাইল। ইহাই সিন্ধু-কোশিস্তান যাহার অপর নাম **'গিরিভুমি'** (Land of mountain)। এই উপত্যকায় ৯০০০ ফুট উচ্চ পর্যন্ত কিছু কিছু কৃষিকাজ হয়। শীতের প্রাবল্যে চাষের এমন কোন গরিমা নাই। তবুও গম, যব, ডাল-কলাই,

ভুট্টা, এবং নানা প্রকার পশুখাদ্য অন্যতম। সিন্ধুর সীমান্তে গিলগিটের অবস্থান। উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই পর্বতাকীর্ণ অঞ্চলে ধান, তুলা ও নানাবিধ ফল উল্লেখযোগ্য ফসল। পাহাড়ের গা কাটিয়া ধাপে ধাপে জমি প্রস্তুত হয় এবং তাহার আলবাঁধে জল আটকানর ব্যবস্থা আছে। পাহাড়ী লোকেরা কাঠের কোদালি দিয়া চাষ করে।

প্রধান হিমালয় ঃ জাস্কর

এই পর্বতশ্রেণীর অবস্থান, বিস্তৃতি ও উচ্চতা অনুসারে ইহাকে **প্রধান হিমালয়** (Inner Himalayas) বলিয়া অভিহিত করা হয়। শ্রীনগরের উত্তর-পূর্বদিকে জোজি-লা গিরিপথ। ইহার উচ্চতা প্রায় ১৫০০০ ফুট পর্যন্ত। ইহার দক্ষিণে পীর-পন্‌জল (১৫০০০-১৮০০০ ফুট) যাহা মধ্য হিমালয়ের অন্তর্গত। প্রধান হিমালর ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী উচ্চ পর্বত **জাস্কর** নামে পরিচিত। এই পর্বতমালার গঠনে আদিম শিলাস্তরের নিদর্শন পাওয়া যায়। জাস্করের শৃংগগুলির উচ্চতা প্রায় ১৯৫০০০ ফুট পর্যন্ত। ১৩৫০০ ফুটের কিছু কিছু যব জাতীয় পণ্য উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর সুউচ্চ অঞ্চলে চাষের নিদর্শন হিসাবে কেবলমাত্র 'কর জোক' অঞ্চলই একমাত্র অঞ্চল যেখানে কৃষিকার্য হয়। এই অঞ্চলের উচ্চতা ১৫০০০ ফুট। এখানের পাহাড়ী ঘোড়ার আদর আছে এবং এই সকল ঘোড়া পর্বতাঞ্চলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বহু অসুবিধার মধ্যেও যাযাবর পশুপালক গোষ্ঠী এই অঞ্চলে বসবাস করিয়া থাকে।

লাডাক্ ও বালটিস্তান

সিন্ধুর এই লাডাক্ অঞ্চলকে '**ক্ষুদ্র তিব্বত**' বলিয়া অভিহিত করা হয়। কৈলাশ পর্বতের উত্তর শিখর হইতে সিন্ধু উদ্ভূত হইয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিকে প্রবাহিত হইয়া গারতং-এর নিকট মিলিত হইয়াছে। নংগা পর্বতের নিকট গিলগিট্ পর্বতশ্রেণী এবং **বুনজি** নামক স্থানে মিশিয়াছে। জনবসতি অনুসারে **বালটিস্তান** অঞ্চল মুসলমানপ্রধান আর লাডাক্ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বাস। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনে হিন্দু বা মুসলমান অপেক্ষা বৌদ্ধজীবনের প্রভাব বেশী। বৌদ্ধপ্রভাব এই অঞ্চলের জনজীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং পশ্চিমে ড্রাস উপত্যকার কারগিল পর্যন্ত এই বৌদ্ধপ্রভাব লক্ষ্য করার মত।

এই সিন্ধুবিধৌত অঞ্চল শুষ্ক, অনুর্বর ও প্রস্তরময়। কোথাও কোথাও জনবসতি, আছে সেখানে **উইলো** গাছ দেখা যায় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে **যব** প্রধান। ঠিকভাবে সার দিলে কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে এই ১৫০০০ ফুট উচ্চ ভূমিতেও গম উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলে গরু ও ইয়াক ষাঁড়ের সংকর এক প্রকার জন্তু দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে জনজীবনে যাযাবরের প্রভাব দেখা যায়, কেন না শীতের আধিক্যে ঐ মানুষকে অন্যত্র চলিতে হয় বলিয়া স্থায়ী ঘর-দোর করা সম্ভব নয়। যদিও লাডাক্ অঞ্চলের অধিবাসীরা স্থায়ী কৃষকের জীবন যাপন করে। তিব্বতের অঞ্চল হইতে এই অঞ্চলে স্থানীয় ভাবে কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য চলে এবং বৌদ্ধবিহারের সন্ন্যাসীরা এই সকল অধিবাসীদের প্রয়োজনের সময় অর্থাদি সাহায্য করিয়া থাকেন।



বুদ্ধদেব

কারাকোরাম

পামিরকে 'পৃথিবীর ছাদ' বলা হয়। কেননা প্রায় ২৫০ মাইল বিস্তৃত শাইয়ক হইতে হুনজা পর্যন্ত অঞ্চলে পৃথিবীর একমাত্র গিরিশৃংগ সন্নিবেশিত অঞ্চল। এখানে প্রায় ২৪০০০ ফুট উচ্চের অথবা ততোধিক ৩৩টি শৃংগ রহিয়াছে। গাশেরব্রুম পর্বতশৃংগ প্রায় সর্বত্র ২৬০০০ ফুট উচ্চ এবং এর শিখরের উচ্চদেশ কোথাও কোথাও ২৮২৫০ ফুট। তবে কাঞ্চনজঙ্ঘার মত সুদৃশ্য বা শিখর সংযুক্ত নয়।

স্থানীয় অর্থে 'কারাকোরাম' হইল 'কালো পাথর' এবং এই কারাকোরাম

পর্বত হিমালয় হইতেও প্রাচীন। প্রায় ১৪০০০ হাজার ফুট উচ্চে টাংকসীর নিকট একটি জনবসতি আছে। সেখানের লোকের উপজীবিকা কৃষিকাজ। তাহারা ঐখানে কিছু উইলো গাছ এবং কিছু কিছু যব উৎপন্ন করে। ঐ স্থানের গিরিপথ দিয়া ছয়মাস কাল যাতায়াত হয় এবং স্থানীয় বাণিজ্য চলে। শ্রীনগর ও অমৃতসর হইতে চিনি বা লবণ এবং চীন অঞ্চল হইতে রেশম দ্রব্য আসে।

মধ্য হিমালয়

হিমালয়ের এই অঞ্চলে দুইটি বৃহৎ পর্বত রহিয়াছে। উত্তরের **কারাকোরাম** পর্বত আর দক্ষিণের হিমালয় জাস্কর। ইহাদের মধ্য হইতে **সিন্ধু** নদীর উদ্ভব হইয়াছে। দক্ষিণের দিকে সুপ্রসিদ্ধ **কাশ্মীর উপত্যকা** যাহা **পীর-পন্‌জল** দ্বারা বেষ্টিত। পীর-পন্‌জল সোজা উপরের দিকে উঠিয়া অবশিষ্ট অংশ হইতে পৃথক রহিয়াছে। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তারতম্য



মধ্য হিমালয়

রহিয়াছে। সাধারণত জানুয়ারি হইতে মার্চ পর্যন্ত সময়ে ৩৫″ ইঞ্চি পরিমাণ বারিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের সহিত অরণ্য-প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ অঞ্চলে খর্বাকৃতি জংগল আর উচ্চ অংশে গভীর 'চির্' বা

চিল্ গাছের অরণ্য। এই অরণ্য হইতে **রেসিন** পাওয়া যায় যাহা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কাগজ ও সাবান তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে এই শিল্প ব্যাহত হইয়াছিল। ইহার পাদদেশে স্থায়ী জল পাওয়া কঠিন। জলসেচনের কোন সুবিধা নাই বলিয়া ব্যাপক কৃষি প্রায় অসম্ভব। যে অল্প পরিমাণ কৃষির আয়োজন আছে তাহার জন্য বাহির হইতে মজুর আসে। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে গম, যব, সরিষা, রবিশস্য এবং ভুট্টা ও বাজরা খারিফ শস্য। তবুও এ অঞ্চলের **খনিজ** সম্পদের মধ্যে **আনথ্রাসাইট** (Anthracite) উল্লেখযোগ্য। তাহার মধ্যে ৬০-৮২% কার্বন আছে। অনেকের মতে ঐ অঞ্চলে এলুমিনিয়মের জন্য **বক্সাইট** পাওয়া যাইতে পারে। জম্মুর এই অঞ্চলে জনবসতি বেশ ঘন। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে হিন্দু **ডোগরাদের** বাস। পন্চ-এর পশ্চিমে মুসলমানদেরই বাস বেশী। পীর-পন্জল প্রকৃতপক্ষে মূল হিমালয়ের পূর্বদিকের বিভাজন। প্রায় ১৩,০০০ ফুট উচ্চের ঐ পর্বতাংশে চির তুষার বিরাজমান। এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হিমবাহ (glacier) বর্তমান। এখানকার **বানিহাল** গিরিপথ প্রায় ২,৭৪৪ মিটার অর্থাৎ ৯০০০ ফুট উচ্চ। শীতকালে বরফ-ঢাকা থাকে। এইজন্য সকল ঋতুতে ঐ পথে যাতায়াত সম্ভব নয়। ফলে ইহার প্রায় ২০০০ ফুট নীচে **জহরটানেল** নামে এশিয়ার দীর্ঘতম ২৫/৮ কিলোমিটার সুড়ঙ্গ পথ তৈয়ার করা হইয়াছে। উহার নিকট বিতস্তা (Jhelum) নদী বহিয়া গিয়াছে। ঐ বিতস্তা উপত্যকা **কাশ্মীর উপত্যকা** নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। এই উপত্যকা প্রায় ৮৪ মাইল বিস্তৃত এবং ৫২০০ ফুট উচ্চ। এই উপত্যকা ক্ষয়ে আসা পর্বতের জমা পলিজাতীয় মাটি, ও বালুকণায় পূর্ণ। এই জমা স্তরকে **কারেয়া** (Karewas) বলা হয়। এই উপত্যকায় কাশ্মীরের রাজধানী **শ্রীনগর** (৫২০০ ফুট উচ্চে) অবস্থিত। এই উপত্যকায় কিছু কৃষিকার্য হয়। কৃষকেরা ধান চাষের জন্য বিশেষ যত্ন নেয় এবং জমিতে সার দেয়। গম বা ভুট্টা চাষের জন্য তেমন কোন চেষ্টা নাই। শীতের আধিক্যের জন্য এখানে কৃষিকার্যেরও তারতম্য আছে। বিশেষভাবে বরফ-গলা জলের উপর নির্ভর করিয়া চাষের কাজ শুরু হয়। পরের পৃষ্ঠার ছকটি দেখিলে সহজে চাষের ধরন বুঝা যাইবে।

ছক—ক

চাষের কাজ (কাশ্মীর উপত্যকা)

মার্চ	লাঙল দেওয়া, গোবর সার দেওয়া
এপ্রিল	সার/মাটি দেওয়া। খরিফ ফসল ধান/তিল, তিসি বীজ বোনা
মে-জুন	সরিষা-তৈলবীজ তোলা/গ্রীম বোনা (৭০০০ ফুট উচ্চে]
জুন-জুলাই	ধানক্ষেতের আগাছা তোলা/গম-যব, রবিশস্য তোলা
জুলাই-আগস্ট	তিসি/ছোলা
আগস্ট-সেপ্টেম্বর	রবিশস্য ; গম/যব বোনার ক্ষেত্র তৈরী, গ্রীম উঠান
সেপ্টেম্বর	সরিষা তৈল বীজের জন্য জমি তৈরী ও বোনা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	ধান ও তিল উঠান/গম বোনা
অক্টোবর-ডিসেম্বর	যব ও আষাঢ়ে গম বোনা
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	শীতের জন্য কৃষিকাজ বন্ধ

বহির্হিমালয় ও মধ্যহিমালয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল কাশ্মীর উপত্যকা, যাহা **ভূস্বর্গ** নামে পরিচিত। একদিকের উলার হ্রদ অপর দিকে শ্রীনগর শহর। পাশে ঝিলাম নদী অতি শান্তভাবে বহিয়া যাইতেছে। হ্রদ, পার্বতসংকুল, বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ, শান্ত নদী এই অঞ্চলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেছে। এই সৌন্দর্য দেখিবার জন্য বহু ভ্রমণবিলাসী প্রতি বৎসর বেড়াইতে আসেন। নৌকা বিহার এখানের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী। তুষার মণ্ডিত হিমালয়ের পাদদেশ ঘিরিয়া শীত অঞ্চলের

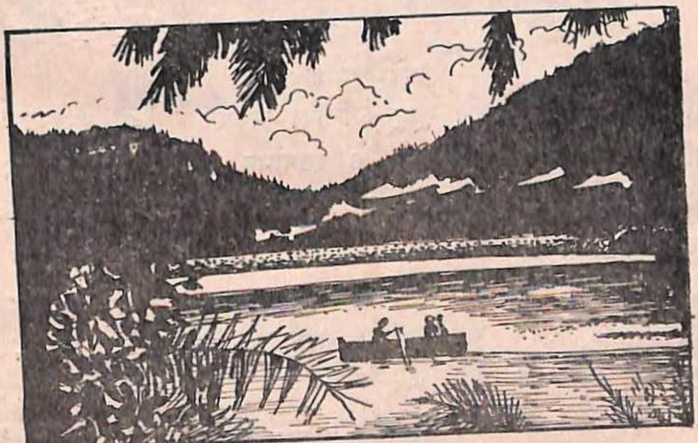


কাশ্মীরী শালের পাড় তোলা

বৃক্ষ পাইন, চেনার, চির প্রভৃতি বিদ্যমান। ঐ সুদৃশ্য অরণ্য নানাভাবে বাহিরের মানুষকে আকর্ষণ করে।

কাশ্মীরে শীতকালে তুষারপাত হয়, অবশ্য অন্য সময় আবহাওয়া নাতিশীতল। পাহাড়ের গায়ে আপেল, ন্যাসপাতি ও কমলালেবু প্রচুর উৎপন্ন হয়।

কৃষি ব্যতিরেকে অন্যান্য উপজীবিকা হইল **রেশম শিল্প**। সূতী কাপড় ও পশমের কাজে বেশ কিছু লোক নিযুক্ত হয়। কাশ্মীরে অন্য উপজীবিকা ভেড়ার চাষ। এই ভেড়াগুলি শীতের দিনে বিভিন্ন অঞ্চলে পশু-পালকের জিম্মায় ঘুরিয়া বেড়ায়। তখন 'উইলো' অথবা শুষ্ক পাতা খাইয়া থাকে। চাষের পর ভেড়ার লোম হইতে পশম তৈরী হয়। এই পশম শিল্পে প্রায় ৩০০০০০০ লোক জীবিকার্জন করে। কাশ্মীরী শালের পূর্ব গারমা এখন না থাকিলেও আদর কম নাই। এইজন্য অনেক কুটির-শিল্প ও কম্বল ইত্যাদি তৈয়ারীর জন্য বেশ কয়েকটি কারখানা আছে। চামড়ার কাজ, কার্পেট, গায়ে দেওয়ার ভালো কম্বল এই অঞ্চলে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। কাশ্মীরে কাঠের কাজের খ্যাতি আছে। স্থানীয় জংগলের কাঠ হইতে ক্রিকেট ব্যাট তৈয়ী হয়।



কাশ্মীরে হ্রদের দৃশ্য

শ্রীনগরের সৌন্দর্য তাহার স্বাভাবিক নদী ও হ্রদ আর উদ্যান। পর্বতারোহণ ও শিকার তার অন্যতম আকর্ষণ। জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে রাস্তা হওয়ার জন্য ভ্রমণবিলাসীদের সুবিধা হইয়াছে।

হিমাচল প্রদেশ

পূর্ব পাঞ্জাবের হোসিয়াপুর জেলা, কাংড়া জেলাকে মোটমুটিভাবে অব-হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এই অঞ্চলের আয়তন প্রায় ১৮০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২,৫০০,০০০। এই অঞ্চল ধীরে ধীরে হিমাচল প্রদেশের কুমায়ুন দেরাডুন হইয়া নেপাল পর্যন্ত চলিয়া



বরফের উপর স্কী খেলা

আসিয়াছে। এই অঞ্চলে **কুলু** উপত্যকা অবস্থিত। এই অঞ্চলের জনবসতির বেশীর ভাগ লোক কৃষি, ও পশুপালন করিয়া জীবিকার্জন করে। পর্বতের উচ্চ শিখরে তুষারপাতের জন্য কৃষিকাজে নিত্য-নিয়মিত বিঘ্ন হয়। **লাহুল, চন্দ্রভাগা** (Chenub) নদীর উপত্যকায় এবং স্পিটিতে কিছু পরিমাণ জায়গায় বরফ গলিয়া গেলে বীজ বোনা হয় বিশেষভাবে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে। আরও দক্ষিণে বা কাংড়া জেলায় যব, গম, ছোলা প্রভৃতি রবিশস্য উৎপন্ন হয়। এই সকল বীজ সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে বোনা হইয়া থাকে। ভুট্টা ও ধান এপ্রিল-মে মাসে বপন করা হয়। এগুলি খরিপ শস্য। অনেক সময় ক্ষেতগুলিকে কৃষকেরা পাথরের দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া রাখে। উচু-নীচু পার্বত্য জমি বলিয়া পাহাড়ের গা কাটিয়া ধাপে ধাপে চাষ হয়। কাংড়া জেলায় অতি অল্প পরিমাণ (৯০০০ একর) জমিতে চা চাষ হয়। সম্প্রতি আলুর চাষ বাড়িয়াছে এবং তাহা স্থানীয়

লোকের চাহিদা মিটাইতে চলিয়াছে। ভারতের মধ্যে হিমাচল প্রদেশে (Apple State of India) অধিক আপেল উৎপন্ন হয়।



আপেল

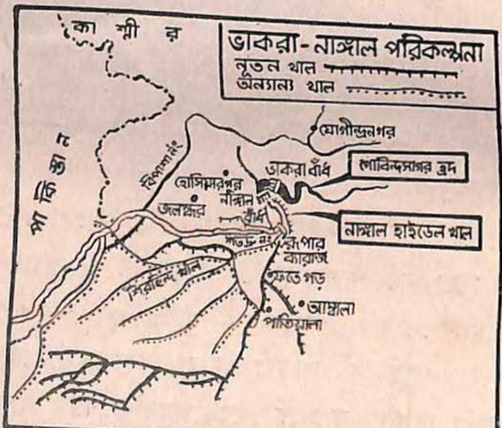
এই অঞ্চলের অরণ্য সম্পদ উল্লেখযোগ্য। এই অরণ্য হইতে সাধারণত দেবদারু এবং 'চির' কাঠ পাওয়া যায়। জংগলে বাঁশ, সাবাই প্রচুর পাওয়া যায়। সাবাই হইতে দড়ি তৈয়ার হয়। মাটির ক্ষয় নিবারণের জন্য নদীর ধারে বা পর্বত গাত্রে নানাপ্রকার গাছ বসান হইতেছে। বিশেষভাবে সরকার ফলের বাগান করিবার জন্য জনসাধারণকে নানাভাবে উৎসাহ দিতেছেন। সিমলার পার্বত্য সৌন্দর্য দেখিবার জন্য বহু লোক সেখানে যান। ওখানে **কুফ্রি** নামক স্থানে বরফের উপর স্কীইং করে।

এই অঞ্চলের **খনিজ** সম্পদ বলিতে গেলে সীসা, তামা, এন্টিমনি ও দস্তা উল্লেখযোগ্য। লাহুল উপত্যকার কাছে এন্টিমনি ও দস্তা পাওয়া যায়। আর কাংড়া অঞ্চলে **শ্লেট** পাওয়া যায়।

এ অঞ্চলে উহাল (Uhl) হইতে ব্যারট-এ ৩০০০ ফুট নীচে জল পতিত হয় এবং তাহা হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ৪৮০০০ (kw) কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং অমৃতসর ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকে। **সিমলা, ডালহৌসী** প্রভৃতি পার্বত্য শহরগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে।

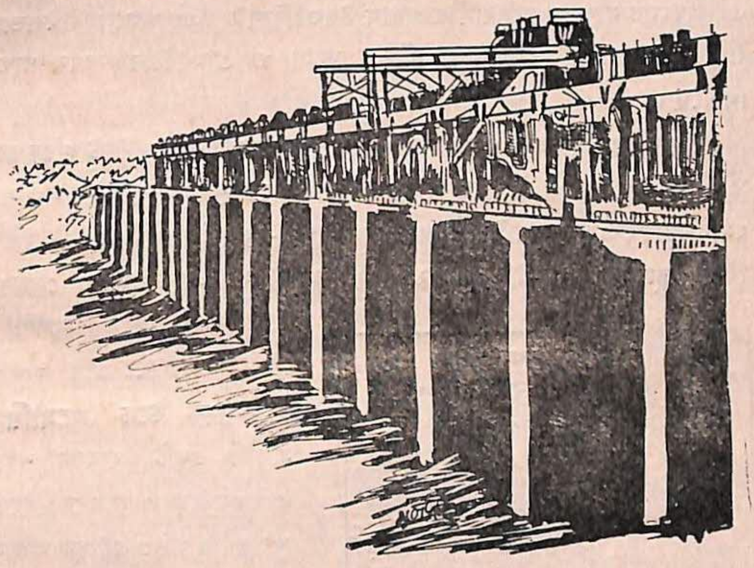
ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা

পাঞ্জাবের নদী পরিকল্পনার ইহা একটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা। পাঞ্জাবে বৃষ্টিপাত কম। সুতরাং জলসেচ-ব্যবস্থায় কৃষির উন্নতি এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। এই পরিকল্পনা ১৯৬১ খৃস্টাব্দে আরম্ভ হয়। দুইটি বাঁধ (একটি ভাকরা ও অপরটি নাঙ্গাল) শতদ্রু নদীর তীরে কংক্রিটে নির্মিত। ফলে জল আটকাইয়া জলবিদ্যুৎ সৃষ্টি করা সম্ভব। নাঙ্গাল বাঁধের কার্য শেষ হইয়াছে। ইহা ১০২৯ ফুট দীর্ঘ, ৪০০ ফুট প্রস্থ এবং ৯১ ফুট উচ্চ। স্থানটি পাহাড় দিয়া ঘেরা অত্যন্ত মনোরম। বাঁধের পশ্চাতে জল জমিয়া বিরাট হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। নাঙ্গাল



হইতে ৪০ মাইল দীর্ঘ খাল কাটা হইয়াছে। ইহার নাম **নাঙ্গাল-হাইড্রেল** খাল। এই খালের গাঙ্গোয়াল ও কোটলা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে ৯৬ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। ভাকরা বাঁধ নাঙ্গাল খালের ৮ মাইল উপরে। ইহার উচ্চতা ৭৪০ ফুট, দৈর্ঘ্য ১৭০০ ফুট এবং প্রস্থ ১১০০ ফুট। ইহা পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাঁধ। ইহার পিছনে গোবিন্দসাগর নামে যে জলাধার

রহিয়াছে তাহার জলধারণ ক্ষমতা ৭৩ লক্ষ ঘন ফুট। নাঙ্গাল-হাইড্রেন খাল হইতে জলধারা সমগ্র পাঞ্জাব রাজ্য ও রাজস্থানের মধ্য অঞ্চলকে প্লাবিত করে।



ভাকরা-নাঙ্গাল

সমগ্র পরিকল্পনায় ৫৮ একর লক্ষ জমিতে জলসেচ হয়। তাহাতে ১৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, ৮ লক্ষ টন তূলা, ৫ লক্ষ টন ইক্ষু ও ৩ লক্ষ টন তৈলবীজ পাওয়া যায়। ইহা ভারতের বৃহত্তম পরিকল্পনা। ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনায় পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ উপকৃত। এই পরিকল্পনায় মোট ১৭৪ কোটির বেশী টাকা ব্যয় হয়।

কুমায়ুন

হিমাচল প্রদেশের অন্যান্য অংশ হইতে কুমায়ুন অঞ্চল একেবারে পৃথক নয়। এই বিভাগে প্রধানত আলমোড়া, গাড়ওয়াল, নৈনিতাল প্রভৃতি কতকগুলি জেলা আছে। এই অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে অব-শিবালিক পাদদেশ ভবর হইতে উদ্ভূত। এই অঞ্চলের কতকগুলি শৃংগ **কেদারনাথ ও বদরীনাথ** (২২০০০′-২৩০০০′ ফুট) হিন্দুদের কাছে পবিত্র তীর্থস্থান। এই স্থান হইতে ভাগীরথী ও অলকানন্দা উদ্ভূত। অলকানন্দার অপর পারে কামেট শৃংগ (২৫,৪৪৭ ফুট)

সংগে অতি সুন্দরভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। গ্রীষ্মের দিনে যে সকল অস্থায়ী গ্রাম গড়িয়া উঠে শীতের দিনে সেগুলি পরিত্যক্ত হয়। ঐ পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের শীতের দিনে অপেক্ষাকৃত নীচু জায়গায় নামিয়া আসিতে হয় এবং পর্বতগাত্রে ঐরকম অস্থায়ী শীতকালীন গ্রাম গড়িয়া উঠে। শীতের দিনে পুরুষেরা **'ভবর'** অঞ্চলের বাজারে এমনকি আরও দূর-দূরান্তের বাজারে তাহাদের তৈয়ারী করা পশমের জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া যায় তখন নারীরা পশমী জিনিস তৈরি করার কাজে ব্যস্ত থাকে। এমন কী তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলে এইসব লোক যাতায়াত করিয়া থাকে এবং নিজেদের সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঐ সময় সংগ্রহ করিয়া থাকে। জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য পাহাড়ী ঘোড়া, ভেড়া ও ছাগলই যথেষ্ট। এক একটি ছাগল প্রায় ৪০ পাউণ্ড পর্যন্ত বহন করিতে পারে এবং সারাদিনে ৫।৬ মাইল চলিতে পারে। দীর্ঘদিন পুরুষদের অনুপস্থিতিতে সাহসের সংগে জীবনযাত্রা চালাইতে ভোটিয়া মহিলারা বিশেষ অভ্যস্ত।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে সমবায় সমিতিগুলি জনজীবনে নানা পরিবর্তন আনিতে সমর্থ হইয়াছে। ফলে অর্থনৈতিক জীবনেও নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

নেপাল

ভারতের উত্তর প্রান্তের এই রাজ্যটির উপর ইসলাম, বা পাশ্চাত্য অভিযানের কোন স্পষ্ট নিদর্শন নাই। নেপালে বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ ছাপ রহিয়াছে তবুও তাহার মধ্যে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সংস্কৃতিকেও উপেক্ষা করা যায় না। নেপালের ভাস্কর্য ও শিল্পে চৈনিক ও ভারতীয় সংস্কৃতির এক মিশ্রণ দেখা যায়। গুরুং, মারাগ, ভোটিয়া নেপালের প্রধান অধিবাসী। যাহাদের দেহে মংগোল বা পীতগোষ্ঠীর প্রভাব রহিয়াছে।

বিভিন্ন উচ্চতার জন্য নেপালকে তরাই বা পাহাড় প্রভৃতি কয়েকটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যাইতে পরে। পূর্ব হিমালয়ের গঠনবৈচিত্র্য ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে থাকে। আসামের দিকে এই হিমালয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী ও অরণ্যের গভীরতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শৃংগের মধ্যে গোঁসাইস্থান (২৬,৩০৫′), চো অহয়ু (২৬,৮৬৭′), এভারেস্ট (২৯,০২৮′) মাকালু (২৭,৮০০′) কাঞ্চনজংঘা (২৮,১০০′) এভারেস্ট পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চতম পর্বত শৃংগ।

কুশী পরিকল্পনা

হিমালয়ের হিমবাহ অঞ্চলে উদ্ভূত এই নদীটি নেপালের মধ্য দিয়া, বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়া গঙ্গানদীতে পতিত হইয়াছে। নদীর তীব্রগতির জন্য নেপালের বহু ক্ষয় হয় এবং প্রতি বৎসর বিহারে বন্যা হইত। ইহার জন্য যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তাহাতে নেপালের বরাহক্ষেত্র মন্দিরের এক মাইল উত্তরে ৭১০ ফুটের একটি উচ্চ বাঁধ নির্মিত হইবে। জলাধারে দশ লক্ষ একর ফুট জল থাকিবে। কয়েকটি খাল কাটিয়া বিরাট অঞ্চলে জলসেচনের ব্যবস্থা হইবে। হনুমাননগর ব্যারেজের নিকট যে খাল কাটা হইবে তাহাতে উত্তর বিহারের চারিটি জেলা—মজঃফরপুর, দ্বারভাঙা, পূর্ণিয়া ও উত্তর ভাগলপুর জল পাইবে। এই পরিকল্পনা সার্থক হইলে প্রায় ১৮ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে। পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ১৭৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং মৎস্য চাষ, ম্যালেরিয়া নিবারণ, বন্যারোধ প্রভৃতি সম্ভব হইবে।

তিস্তা বিধৌত অঞ্চল

গাংগেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের ঠিক অপরদিকে তিস্তা নদী বিধৌত অঞ্চল। দার্জিলিং-এর পাদদেশ দিয়া এই নদী বরফগলাজলে পুষ্ট আবার অতিরিক্ত বর্ষায় এই নদীতে বন্যা আসে। একদিকে দার্জিলিং প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান। অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য পর্বতগাত্রে ক্ষয় হয় এবং নিত্য নিয়ত ধ্বস নামে। সিকিমের অংশ হইতে সমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দার্জিলিং-এর গায়ে চায়ের চাষ হয়। দার্জিলিং হইতে আট মাইল দূরে **শিলিগুড়িতে** আমরা উচ্চভূমির ও সমভূমির মিলন দেখিতে পাই। রেলপথে আসামের সংগে সংযোগ স্থাপিত হওয়ার পর এবং বিরাট জাতীয় সড়ক নির্মিত হওয়ার পর এই সকল অঞ্চলের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। দার্জিলিং-এর পর্বতগাত্র আর সিকিমের অঞ্চল ঘেঁষিয়া পশুচারণের মত কিছু ক্ষেত্র আছে। পর্বতগাত্রে অবিন্যস্ত কুটির সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভুটান হিমালয়ের অংশ। শ্বাপদসংকুল অরণ্যরাজিতে পূর্ণ। ইয়াক জাতীয় পশুই এই অঞ্চলের প্রধান জন্তু। পশ্চিমবংগে **জলঢাকা** নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে কিছু কিছু শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে।

আসাম-হিমালয় অঞ্চল

পূর্ব হিমালয়ের পর্বতগ্রন্থি ধীরে ধীরে আরও পূর্বে বিস্তৃত হইয়াছে। এই পর্বতগ্রন্থি হইতে পাটকোই, নাগা, লুসাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানের উচ্চ শৃংগ হইল **নামচা বাড়োয়া** (২৫,৫০০)। আসামের মধ্যভাগ দিয়া পূর্ব সীমা পর্যন্ত রহিয়াছে **গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া** পাহাড়। পরে এই পাহাড় পূর্বপ্রান্তে **বরাইল** পাহাড়ে গিয়া মিশিয়াছে। এই পর্বতগ্রন্থির তলদেশ সমুদ্রের মধ্য দিয়া ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতিদের বাস বেশী এবং কমলালেবু, তূলা প্রভৃতির চাষ হয়। বাঁশ, বেত প্রভৃতি বনজ উদ্ভিদ। আসামে পাহাড়ের গায়ে চাষ হইয়া থাকে।

পার্বত্য-অঞ্চল ও মানবজীবন

ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমার পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হইল ইহা পৃথিবীর ছাদ পামির হইতে বাহির হইয়া পূর্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ মাইল। এই হিমালয় পর্বতমালা ভংগিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে দেখিলে মনে হইবে যেন সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী পর পর বিস্তৃত রহিয়াছে—সর্ব দক্ষিণ শ্রেণীর উচ্চতা কম—অব হিমালয়—যাহাতে শিবালিক পর্বত রহিয়াছে। তাহার পর বিরাট উপত্যকা যেখানে চঞ্চল জনজীবনের নিদর্শন পাওয়া যায় সে উপত্যকায় পূর্ব অংশের নাম **মারে** আর পশ্চিমাংশের নাম **ডুন**। মধ্যভাগের পর্বতশ্রেণীর কিছুটা বারমাস তুষারে ঢাকা থাকে। উত্তরের পর্বতশ্রেণী সবচাইতে উচ্চ—বিভিন্ন গিরিশৃংগ অবস্থিত। ভারতের দক্ষিণে উপসাগর ও মহাসাগরের জলীয় বাষ্প গ্রাষ্মকালে বাহিত হইয়া হিমালয় পর্বতে বাধা পায়, ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। মধ্যভাগের অঞ্চলে জল জমিয়া নদী-প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে। বিতস্তা (Jhelum), চন্দ্রভাগা (Chenub) উল্লেখযোগ্য নদী। আবার গ্রীষ্মকালে বরফগলা জলে নদীগুলি পুষ্ট হয়। ফলে উপত্যকা অঞ্চলে কৃষিকার্য চলে। যদি হিমালয়ের উচ্চ পর্বতমালা একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত থাকিত তবে জলীয় বাষ্প বাধা পাইয়া প্রবল বন্যা হইত ও ধ্বস নামিত। উত্তরের শীতল বাতাস হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বরফগলা জলে পুষ্ট নদীগুলির জন্য পলিমাটিতে গড়িয়া উঠা সমভূমি সম্ভব হইয়াছে। আর স্রোতের বেগের জন্য জলবিদ্যুৎও সৃষ্টি হইতেছে যাহা শিল্প ও নানা কাজে সহায়ক। পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশ হইতে উপর দিকের

অরণ্যে নানাবিধ গাছ থাকায় অনেক মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। সরকারী পৃষ্টপোষকতায় হস্তশিল্প বিশেষভাবে কাঠের কাজের জিনিসগুলি ঐ সকল অঞ্চলে পাওয়া যায়। উপত্যকাগুলিতে অনেক তৃণভূমি থাকায় পশুপালনের সুবিধা হয়। শীতের দেশের বিরাট লোমযুক্ত ছাগল ও ভেড়া থাকায় তাহাদের লোমে মূল্যবান পশম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অমৃতসর, লুধিয়ানা প্রভৃতিতে ঐ সকল পশমী দ্রব্যের কারখানা যথেষ্ট রহিয়াছে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে এবং আসামের পাহাড়ের গায়ে চায়ের চাষ হয়। কোন কোন অঞ্চলে খনিজ তৈল ও ধাতুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্ভব না হইলেও বর্তমানে বহু জাতীয় সড়ক ও টানেল প্রভৃতি নির্মিত হওয়ায় যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। পাহাড়িয়া অঞ্চলের অধিবাসীরা সাহসী ও সহিষ্ণু বলিয়া দেশরক্ষার জন্য সামরিক বিভাগে তাহাদের আদর আছে।

হিমালয় ও ভারত সমাজ সংস্কৃতি

ভারতের উত্তরে সুদীর্ঘ ও সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই পর্বতমালার অবস্থান নিঃসন্দেহে ভারতের জন-জীবন ও ও সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

(১) হিমালয় দুর্লংঘ প্রাচীর বলিয়া ভারত ভূখণ্ডের এক স্বাভাবিক সীমা বলিয়া চিহ্নিত। ইহার ফলে অবাধ যাতায়াত প্রতিহত এবং আক্রমণকারীরা অথবা অপরাপর গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সহজে ভারতভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার এক বেগবতী ধারা অপ্রতিহত-ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। হিমালয়ের অবস্থান উত্তর সীমান্তে না হইলে ভারতীয় সভ্যতা অবাধ সংস্রব ও সমন্বয়ে অন্যরূপ ধারণ করিতে পারিত। তবুও সংকীর্ণ গিরিপথ বিশেষভাবে খাইবার, বেলান, জোজি-লা প্রভৃতির মধ্য দিয়া মধ্য এশিয়ার সংগে সীমিত ব্যবসা-বাণিজ্য চলিয়াছে ও জনসমষ্টির ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(২) হিমালয় পর্বতশ্রেণী মধ্য এশিয়া ও তিব্বতের শীতল বায়ুপ্রবাহের উদ্দামতাকে আড়ষ্ট করিয়া দিয়াছে। আবার দক্ষিণের সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প বাধা পাইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাইয়া নদ-নদীগুলিকে প্রাণবন্ত ও গতিশীল করিয়া রাখিয়াছে। ইহার প্রবাহে গাংগেয় সমভূমির উদ্ভব সম্ভব। এবং এই

সমভূমি হইল প্রধান শস্যোৎপাদন ও উর্বরযুক্ত অঞ্চল। ইহার প্রভাবে দেশের সমৃদ্ধি সাধন সম্ভব হইয়াছে।

(৩) হিমালয় হইতে বহু নদ-নদীর উৎপত্তি এই নদীগুলিতে সম্প্রতিকালে নানাভাবে বাঁধ তৈরি করিয়া ও পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের বহু অসেচ এলাকায় জল আনান সম্ভব হইয়াছে এবং নদীগুলিতে বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্টি করিয়া শিল্প প্রসার দ্রুত করা হইয়াছে।

(৪) পর্বতের পাদদেশ অরণ্যাবৃত বলিয়া দীর্ঘ পরিসর অরণ্যাঞ্চল ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধির কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অরণ্য হইতে যেমন প্রচুর কাঠ বা অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায় তেমনি আরও নীচের দিকের তরাই অঞ্চল হইতে ঘাস বা গুল্ম পাওয়া যায় যাহা কাগজ তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে হিমালয় ভারতীয় জন-জীবন ও সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

অনুশীলনী

১। হিমালয় পর্বতমালাকে তাহার বৈশিষ্ট্য অনুসারে কতগুলি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে? তাহাদের নাম বল।

২। হিমালয় পর্বতমালার আকর্ষণ কি?

৩। রেসিন কোথায় পাওয়া যায়? তাহা কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

৪। কাশ্মীর উপত্যকা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে জন-জীবনের যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায় কাশ্মীর উপত্যকায় চাষের প্রণালী বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহার বিবরণ দাও।

৬। কৃষি ব্যতীত কাশ্মীরবাসীদের অন্য উপজীবিকা কি? তাহার বিবরণ দাও।

৭। হিমালয়ের বিভিন্ন পর্বত শৃংগের নাম বল ও তাহাদের উচ্চতা লিখ।

৮। লাডাক বালটিস্তানে কোন্ ধর্মাবলম্বীদের বাস?

৯। স্পিটি বা কাংড়া জেলার চাষের বর্ণনা কর।

১০। ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা সম্পর্কে লিখ।

১১। কুমায়ুন অঞ্চলের জীবনযাত্রা বর্ণনা কর।

১২। নিম্নলিখিত অঞ্চল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:

(ক) জহর টানেল, (খ) হিমবাহ, (গ) কারেয়া, (ঘ) কারাকোরাম, (ঙ) কুম্ভমেলা, (চ) কুশী পরিকল্পনা, (ছ) তিস্তা বিধৌত অঞ্চল।

১৪। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) কাশ্মীরের রাজধানী —। (খ) শীতের দিনে কাশ্মীরী ভেড়া — খায়। (গ) পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র — স্থানে — ফুট উচ্চে চাষের কাজ হয়। (ঘ) ফরেস্ট লেবরেটরী — তে অবস্থিত। (ঙ) পৃথিবীর বৃহত্তম পর্বত শৃংগ — এবং তাহার উচ্চতা —।

১৫। (ক) ভারতের ইক্ষুর চাষ অধিক—উত্তরপ্রদেশ/পাঞ্জাব/ স্পটি।

(খ) ভারতের আপেলের রাজ্য—হিমাচল/পাঞ্জাব/উত্তর প্রদেশ।

৩ গাংগেয় সমভূমি

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে দিল্লির **শৈলশিরা** (ridge) হইল উত্তর ভারতের প্রধান জল বিভাজিকা। তাহা হইতে পশ্চিমে সিন্ধুর উপনদী শতদ্রু, ইরাবতী আর পূর্বে **গংগা** ও **যমুনা**। গংগা ও যমুনা ধীরে ধীরে পূর্ব-দক্ষিণে বহিয়া আসিয়া বিরাট সমভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে পৃথিবীর অন্যতম **পলিময় সমভূমি** বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০০ মাইল আর প্রস্থে প্রায় ১৫০ হইতে ২৫০ মাইল।

এই পলিময় সমভূমিকে মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) উপরের পলিময় সমভূমি।

(২) মধ্যভাগের পলিময় সমভূমি।

(৩) নিম্নের পলিময় সমভূমি বা পশ্চিমবংগের ব-দ্বীপ অঞ্চল।

ভারতের সর্বপ্রধান **গংগা** নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০০ মাইল। কেবল পুণ্যার্থী নরনারীর চোখে গংগা পবিত্র নয়—এই নদীর উপকারিতা অনেক বেশী। উত্তরপ্রদেশের উত্তরাংশে হিমালয়ে **গংগোত্রী** নামক স্থানে ইহার উৎস। তাহার পর পার্বত্য পথে সর্পিল গতিতে আসিয়া হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে পতিত হইয়াছে। এই অংশে উপনদী **অলকনন্দা**। উপরের পলিময় সমভূমি মূলত উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লইয়া গঠিত। যমুনা, গংগা ও ঘাঘরা নদীর বিধৌত পলিময় অংশ উত্তরের শিবালিক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পূর্বদিকে ঐ শিবালিকের অংশ মোটামুটিভাবে নেপালের **সারদা** পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণের এই সীমারেখা বিন্ধ্যপর্বতের অংশ দ্বারা

সীমিত। বিশেষভাবে যমুনার উপনদী যেখানে **চম্বল, বেতয়া** এবং **কেন**-এর প্রস্তরময় ভূখণ্ডে আবদ্ধ। এই পলিময় সমভূমিকে বিভক্ত করিবার জন্য যে কয়টি যুক্তি উত্থাপন করা হয় তাহার মধ্যে উপরের অংশকে যমুনা ও গংগার

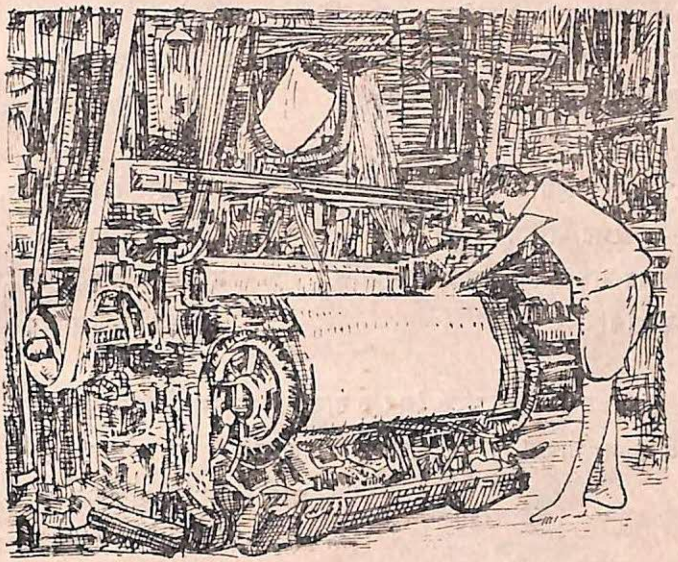


গংগার অববাহিকা

সঙ্গম স্থান **এলাহাবাদ**-কে একটি অংশ ধরা যাইতে পারে। অনেকের মতে উপরের এই অংশে প্রধান ফসল গম আর মধ্যের অংশের প্রধান ফসল ধান। উপরের এই অংশে জলসেচেরও বিশেষ সুবিধা আছে। এই বিশাল অংশের ভূপ্রকৃতির গঠনের এমন কোন তফাৎ বা বৈচিত্র্য সহজভাবে আমাদের চোখে না পড়িলেও যাহা দেখা যায় তাহা হইল ভবর, তরাই ও ভুর। ভবর ও তরাই হইল জংগলাবৃত অঞ্চল। ভুর অর্থে বালুকামিশ্রিত মাটির অঞ্চল বোঝায়, উপরের পলিময় সমভূমিতে খয়ের, শিশু প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত ফসল হইল গম। ইহার পর ধান, যব, জোয়ার এবং বাজরা। ছোলা ও ভুট্টা যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইক্ষু ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে বর্ষার সময় জন্মায়। ভারতে পৃথিবীর মধ্যে বেশী ইক্ষু চাষ হয়। উত্তরপ্রদেশে প্রায় ৮০টি ইক্ষু কল আছে। সাধারণত উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাবে উর্বর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। পরে নানাবিধ তৈল-বীজ উৎপন্ন হয়। সম্প্রতি কোথাও কোথাও তূলা উৎপন্ন হইতেছে।

স্থানীয় তূলা কাজে লাগাইবার জন্য কানপুরে অনেক কাপড়ের কল আছে। ঐ অঞ্চলের কোথাও কোথাও তামাক-এর চাষ হয়। এই অঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলে



কানপুরের বয়ন-শিল্প

ভাল আমের বাগান আছে ও নানাবিধ সব্জী চাষ হইয়া থাকে। বর্তমানে নানাভাবে জলসেচের ব্যবস্থা বাড়িয়াছে এবং কৃষির অবস্থাও অনেকটা আশাপ্রদ।

বেয়ার অঞ্চলে কিছু কিছু পুরাতন জলসেচের খাল আছে। **সারদা খাল** একটি উল্লেখযোগ্য জলসেচের ব্যবস্থার নিদর্শন। যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে আগ্রা খাল আছে। উহা ছাড়া বিভিন্ন জলসেচের মাধ্যমে কৃষির কাজে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে।

তবুও উন্নত প্রথায় চাষের প্রচলন সত্ত্বেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রথায় চাষের উদাহরণ দেখা যায়। সেখানে বলদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কৃষককে নানাভাবে ঋণ করিতে হয়। সাধারণ ভাবে দোয়াব অঞ্চলে চাষের ধরন নিম্নরূপ ঃ

ছক—খ

দোয়াব অঞ্চলে চাষের ধরন

জুনের মাঝামাঝি—জুলাইয়ের মাঝামাঝি	খরিফ শস্য বোনা
আগস্ট—সেপ্টেম্বর	রবিশস্যের জন্য চাষ
অক্টোবরের প্রথম—নভেম্বরের প্রথম	খরিফ ফসল তোলা ও রবি-শস্য বোনা
ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি	আগাছা নিড়ান, জলসেচ
মার্চ-এপ্রিলের মাঝামাঝি	রবিশস্য তোলা
এপ্রিলের মাঝামাঝি—মে-র মাঝামাঝি	রবি ফসল মাড়াই, বিক্রী
মে-র মাঝামাঝি—জুন	সেচ জমিতে আখের চাষ

উত্তরপ্রদেশে ইক্ষু ক্ষেতে জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় বলিয়া ভাল ফসল পাওয়া যায়। যেহেতু গোচারণের ক্ষেত্র ভাল নাই সেজন্য গরুর স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। গ্রামগুলি ঘন বসতিপূর্ণ। উত্তরপ্রদেশের মধ্য দিয়া বড় বড় সড়ক নির্মাণ হইয়াছে এবং দিল্লির সহিত সংযোগ রক্ষা বা যাতায়াতেও সুগম হইয়াছে। উত্তর-প্রদেশের পাঁচটি বড় শহর—কানপুর, লখনউ, আগ্রা, বারাণসী এবং এলাহাবাদ প্রত্যেকটি শহরের বৈশিষ্ট্য আছে। উত্তরপ্রদেশের আগ্রা ও লখনউ অঞ্চলে ধাতুর নানা রকম পাত্র তৈয়ারী হয়। নিত্য নৈমিত্তিক কাজে অথবা গৃহসজ্জার কাজে ঐ সকল কুটির শিল্পের যথেষ্ট আদর আছে। বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে এই শহরগুলির প্রসিদ্ধি আছে। কৃষিকেন্দ্রিক এই শহর-গুলিতে স্থানীয় উৎপন্ন ফসল কেনাবেচার সুবিধা অনেক। উত্তরপ্রদেশে



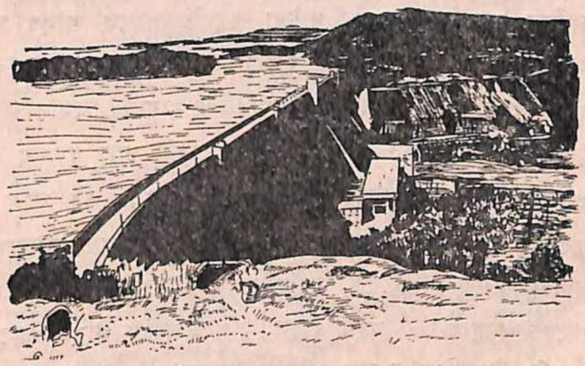
উত্তরপ্রদেশের ধাতুপাত্র

সর্বাপেক্ষা অধিক সরিষা উৎপন্ন হয়। এছাড়া তিল ও মসিনার তৈল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

শিল্পের উন্নতি সম্ভব হয় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। যখন যমুনা নদীতে বাঁধ দিয়া জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার চেষ্টা হয়। ইহা ছাড়া শোন নদীর তীরে রিহাণ্ড, সিংগ্রাউলিতে বৈদ্যুতিক কারখানা রহিয়াছে। কানপুরে সুতার কল, কাঁচ তৈয়ারীর কারখানা, তাঁত, কাঠের কাজ ইত্যাদিরও প্রসিদ্ধি আছে। ইহা ছাড়া অনেক চিনির কল ও চিনিকে শোধন করিবার কারখানা এবং তৈলের কল আছে। আগ্রা, লখনউ, বারাণসীতে নানাবিধ শিল্পকাজ বিশেষভাবে হাতির দাঁতের কাজ, পিতলের কাজ, শাল ও ক্যালিকো প্রিন্টিং-এর জন্য প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলের **চিকন** বা **জরীর** কাজের প্রসিদ্ধি আছে। মির্জাপুরে সম্প্রতি সিমেণ্টের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।



উত্তরপ্রদেশের ধাতুপাত্র

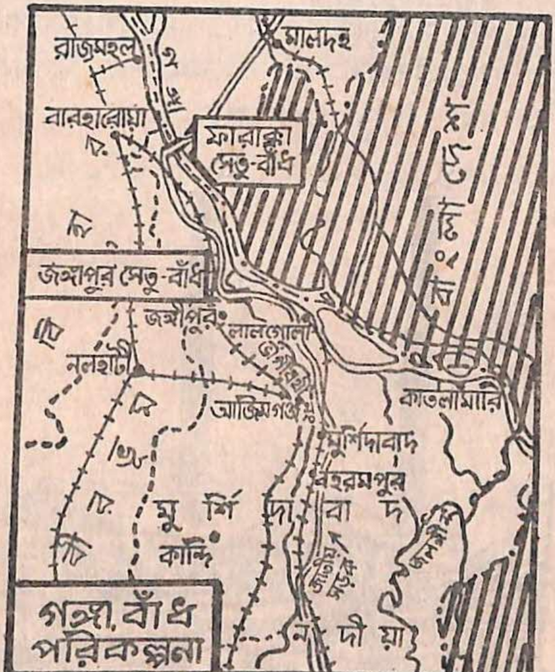


রিহান্ড বাঁধ

মধ্যভাগের পলিময় গাংগেয় সমভূমি ঃ উত্তরপ্রদেশের পূর্বদিকের এক-তৃতীয়াংশ ও উত্তর-বিহারের অর্ধেক গাংগেয় সমভূমির পরিমাণই হইল মোটামুটিভাবে মধ্যভাগের পলিময় গাংগেয় সমভুমি। পূর্ণিয়া জেলায় গাংগেয় সমভূমির সঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুরের গাংগেয় সমভূমির গঠনচরিত্রে এমন কোন পার্থক্য সহজে নজরে পড়ে না। বরং উত্তরবংগের গাংগেয় সমভূমি অঞ্চলের লোকের বিশেষভাবে মেঘনার সংযোগ স্থল হইতে নিম্নবংগের জনসমষ্টির জীবন-যাত্রার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ঐ অঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৬৫,০০০ বর্গমাইল। উপরের দোয়াব অঞ্চল অপেক্ষাকৃত শুষ্ক আর নিম্নবংগের অঞ্চল তাহার বিপরীত। মধ্য অঞ্চলে এই দুই বিশেষ অবস্থা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়াছে মাত্র। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও সময় দুইই উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। বংগোপসাগরের নিকটবর্তী পশ্চিমবংগের এই অঞ্চলে মৌসুমী বায়ুর জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। মধ্যভাগের সমভূমিতে বন্যার পরিমাণ ও ভীষণতা ভয়াবহ। ঐ অঞ্চলে নদী প্রচুর পরিমাণে প্রস্তরচূর্ণ বা বালুকণা বহিয়া আনে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উর্বরতা নষ্ট করিয়া দেয়।

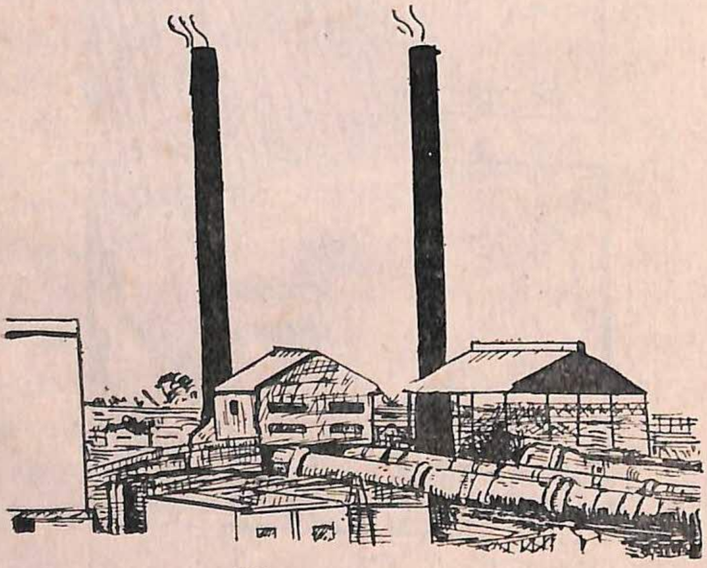
কৃষিকার্যের ধরন ও উৎপন্ন ফসলের অনেক কিছুই মধ্যভাগের গাংগেয় সমভূমিতে এবং উপরের সমভূমিতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে যথেষ্ট ধান উৎপন্ন হয়। সেই সংগে যব, গম, ছোলা, আখ ও নানাবিধ তৈলবীজ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমাঞ্চলে তূলা চাষ হইলেও ধীরে ধীরে পূর্বাঞ্চলে পাট চাষের চাহিদা লক্ষ্য করা যায়। পাটনা প্রভৃতি অঞ্চলে আলুর চাষ দেখা যায়। গংগার উত্তরাঞ্চলে বিহারে ৫% পরিমাণ অংশে জলসেচ হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে মজঃফরপুরের পশ্চিমাঞ্চল, চাম্পারন ও সারনা জেলায় আরও বেশী পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। জমি ঢালু থাকার জন্য খাল কাটিয়া জল আনা বা চাষের ব্যবস্থা বরং উন্নত ধরনের। এর ফলে পূর্বাঞ্চলে বিশেষভাবে পাটনা, ভাগলপুর, গয়া, শাহাপুর প্রভৃতি জেলায় নানাভাবে জল-সেচের ব্যবস্থা আছে। অনেক নদীর কোন অংশকে আটকাইয়া জলসেচের উৎস হিসাবেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে **খরিফ** চাষের বদলে **ভাদাই** অর্থাৎ হৈমন্তিক চাষের পরিমাণ **আঘান** বা শীতের চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কেননা যে মাসে মৌসুমী-বৃষ্টিপাত শুরু হয় অথচ পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাত হইতে তখন যথেষ্ট বিলম্ব থাকে। পশ্চিমবংগে নিম্নাঞ্চলে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা থাকে না অথচ পশ্চিমাঞ্চলের মত একেবারে বিলম্বেও

বৃষ্টিপাত হওয়ার কোন সুযোগও নাই। ফলে চাষের ধরন ও ফসলের রকমফের হইয়া থাকে। সেইজন্য পশ্চিমবংগের অনেকক্ষেত্রে **ভাদোই** শস্য ঘরে তুলিয়া অনেকে আমন ধানের গাছ লাগাইয়া স্বাভাবিক ভাবে দুইটি ফসল পাইয়া থাকে। মধ্যভাগের সমভূমিতে **আযানি-আমনের** চাষের পরিবর্তে **রবিশস্য** বেশী পরিমাণ উৎপন্ন হয়। ভাদাই শস্য বলিতে প্রধানত আউস ধান, ভুট্টা বা পাট বোঝায়—মে মাসের শেষে ক্ষেত তৈয়ার করিয়া বীজ বপন করা হয় আর আগস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফসল ঘরে তোলা হয়। বৃষ্টিপাতের ধরন ও পরিমাণ অনুযায়ী শস্যেরও তফাৎ হইয়া থাকে। জনবসতি, গ্রামের পরিবেশ ও আকৃতি তদনুযায়ী পৃথক। আখ, নীল চাষ ইত্যাদির জন্যও কলকারখানাও যথেষ্ট দেখা যায়। বর্তমানে **ফরাক্কা** বাঁধ সম্পূর্ণ হওয়ায় যাতায়াতের অসুবিধা



অনেক কমিয়াছে। **গংগা বাঁধ** (Ganga Barrage) ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গংগা বাঁধের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনায় কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে। প্রথমত উত্তরবংগের সংগে দক্ষিণাঞ্চলের

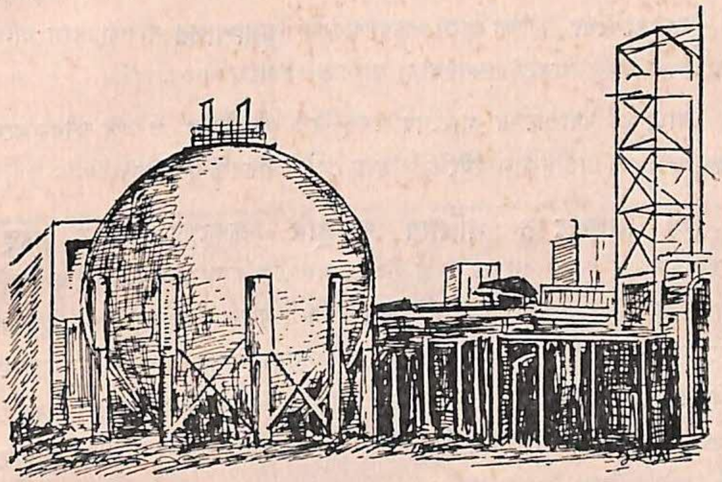
কোন যোগাযোগ ছিল না। ফরাক্কায় বাঁধ হওয়ার ফলে সড়কপথে এবং রেলপথে যোগাযোগ সাধিত হইয়াছে। ক্রমাগত পলি জমিয়া যাওয়ার জন্য ভাগীরথীর উপর প্রচণ্ড রকমের চড়া পড়িয়াছে। ফলে বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় ভাগীরথীর সহিত গংগানদীর কোন যোগ ছিল না। স্টীমারগুলি সোজা হুগলী নদী দিয়া পাটনা বা এলাহাবাদ যাইতে পারে না। কলিকাতা বন্দর মজিয়া যাওয়ার মত হওয়ায় বড় বড় স্টীমার বা জাহাজ ঠিকমত নোঙর করিতে পারে না। যদিও পোর্ট কমিশনার ড্রেজার চালাইয়া গংগানদীকে পলিমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ফলে বন্দর রক্ষার ব্যয় বাড়িয়াছে এবং কলিকাতায় যথেষ্ট জলের অভাব ঘটিতেছে। ফরাক্কায় কংক্রীটের বাঁধের জন্য গংগার কিছুটা জল আটকাইয়া অবশিষ্ট জল বাংলাদেশের পদ্মানদীতে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর ফরাক্কা বাঁধের জল খালের সাহায্যে গংগানদী হইতে ভাগীরথীর উৎস মুখে চলিয়া আসিলে বারমাসই ভাগীরথী ও হুগলী নদীর বালুচরগুলি ধুইয়া সাগরে মিশিবে। ফলে কলিকাতা বন্দরের উন্নতি ঘটিবে এবং কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণ মিষ্টিজল পাওয়া যাইবে।



মির্জাপুরের সিমেন্ট কারখানা

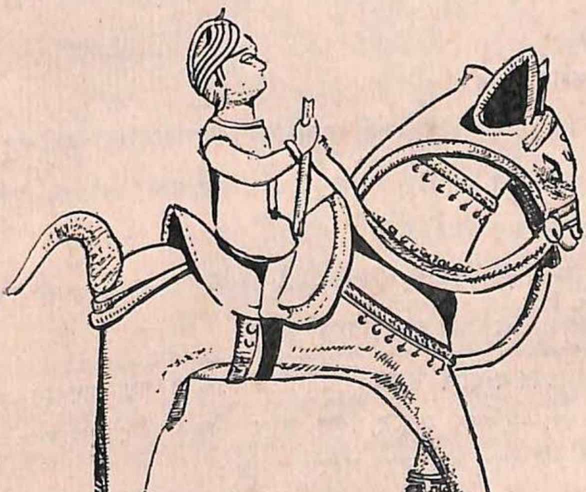
এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শহরগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর, বারাণসী, বিহার রাজ্যের পাটনা, গয়া এবং গোরখপুর। অতি প্রাচীনকাল

হইতে পাটনা—পাটলিপুত্রের ঐতিহাসিক খ্যাতি রহিয়াছে। গৌতম বুদ্ধের তপস্যা ও সিদ্ধিলাভ গয়ার নিকটবর্তী অঞ্চল। বর্তমানের গয়াতে তীর্থযাত্রীর



গোরখপুরে সারের কারখানা

যাতায়াত যেমন আছে ঠিক তেমনি ভাবে ধান, তূলা ও তেলের কল



গয়ার কাঠের কাজ

রহিয়াছে। ভ্রমণামুদে ব্যক্তির জন্য নানাপ্রকার মূর্তি ও কাঠের কাজ

দেখিতে পাওয়া যায়। গোরখপুরে সম্প্রতি সার তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে **চুনাপাথর** পাওয়া যায় বলিয়া মির্জাপুরে একটি সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

মোটামুটি মধ্যভাগের গাংগেয় সমভূমিতে জনবিন্যাস ও জন-জীবন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাচীনকাল হইতে তাহার সেই গৌরব রহিয়াছে।

(৩) নিম্নবংগের পলিময় সমভূমি—নিম্নবংগের পলিময় সমভূমি সাধারণত অবিভক্ত বংগের সমগ্র ব-দ্বীপ অঞ্চলকে ধরা হয় এবং ইহার বিস্তৃতি সুরমা উপত্যকা পর্যন্ত। রাজনৈতিক বিভাগ মূলত ভৌগোলিক বিভাগের সংগে সমতা রাখিতে সমর্থ হয় নাই। সেই হিসাবে নিম্নবংগের পলিময় সমভূমিকে পৃথিবীর বৃহত্তর ব-দ্বীপ অঞ্চল বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ধানকে কেন্দ্র করিয়া এই অঞ্চলে কৃষিকেন্দ্রিক জীবন শুরু, সুতরাং মানুষের দেহমনে এক ভৌগোলিক ঐক্যের ছন্দ ধ্বনিত। অবহিমালয়ের পাদদেশ হইতে এই এই অঞ্চলের এক সীমানা। সুতরাং এই সমভূমির বিস্তৃতিও উল্লেখযোগ্য।

এই সমগ্র ভূখণ্ডকে মোটামুটিভাবে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :

(১) দুয়ার অঞ্চল।

(২) উত্তরের সমবদ্বীপ অঞ্চল, গংগা, ব্রহ্মপুত্র দোয়াব এবং বারিন্দ।

(৩) পূর্বাঞ্চলের প্রান্তিক অঞ্চল—সুরমা উপত্যকা, চট্টগ্রাম উপকূল ও মেঘনার অন্তর্বর্তী সমভূমি।

(৪) পশ্চিমাঞ্চলের প্রান্তিক অঞ্চল—কংকরাকীর্ণ অঞ্চল ও হুগলীর মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং কাঁথি মহকুমার তটভূমি।

(৫) গাংগেয় **ব-দ্বীপ** অঞ্চল : হুগলী-ভাগীরথী ও পদ্মা-মেঘনার মধ্যবর্তী অঞ্চল—দক্ষিণে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। যে অংশকে পুনরায় তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :

(ক) অপরিবর্তিত (Moribund) ব-দ্বীপ।

(খ) পরিপূর্ণ ব-দ্বীপ।

(গ) নবগঠিত বা জেগে ওঠা ব-দ্বীপ।

কেননা এখনও পলিমাটি জমিয়া প্রতি বৎসর কিছু-না-কিছু অংশ ভরাট হইয়া যাইতেছে। ঐ অংশই **সুন্দরবন**। ইহার বিরাট অংশ বাংলাদেশে রহিয়াছে।

গাংগেয় ব-দ্বীপকে অনেকে বহু ব-দ্বীপের সমষ্টি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। ভাগীরথী-হুগলী হইল প্রকৃতপক্ষে গংগার মূল গতিপথ। পদ্মা, মেঘনা এবং আরও অন্যান্য নদীগুলি যথা—ইছামতি, জলংগী, মাথাভাঙা, গরাই প্রভৃতি উপনদীগুলিই মূলত এই ব-দ্বীপ অঞ্চল গড়িয়া তুলিয়াছে।



ভাগীরথী, সরস্বতী, আদিগঙ্গা ধীরে ধীরে পলি জমিয়া মজিতে থাকে। আরও দক্ষিণে ছোটনাগপুরের অঞ্চল হইতে উদ্ভূত দামোদর বা রূপনারায়ণ-এর জল আনিয়া হুগলী নদী যথেষ্ট বেগবতী আছে। তাহা ছাড়া নিত্য নিয়মিত জোয়ার-ভাঁটার ফলে নদীগুলি নাব্য আছে এবং নদীতে বিশেষ পলি জমিয়া সত্বর বন্ধ হইয়া যাইতে পারে না।

এই গাংগেয় সমভূমি বিশেষভাবে ব-দ্বীপ অঞ্চলে মার্চ ও এপ্রিল মাসের দিকে কালবৈশাখী ও প্রবল বর্ষণ হইয়া থাকে। মৌসুমী বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে **ঘূর্ণীঝড়** (Cyclone) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে ঘর-বাড়ীর ধরনে নানা বৈশিষ্ট্য সহজে নজরে পড়ে।

তরাই অঞ্চলের স্বভাবজ উদ্ভিদ শাল, জারুল ব্যতীত তাল, বাঁশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গাছ। বট, অশ্বত্থ, তেঁতুল, আমও এইসব অঞ্চলে জন্মায়। আবার সুন্দরবনের ঢেউ প্লাবিত অঞ্চলের **গরাণ, হিতাল, সুন্দরী, গেঁয়া** প্রভৃতি গাছই বৈশিষ্ট্য। সুন্দরবনের জংগল হইতে মধুসংগ্রহ হয় আর উলুখড় যা পাওয়া যায় তাহা ঘরের ছাউনির জন্য ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনের অরণ্যে রয়েল বেংগল জাতীয় বাঘের উপদ্রব আছে, আর আছে নানা প্রকার বিষাক্ত সাপ। এই অঞ্চলের প্রধান ফসল **ধান ও পাট**। অবশ্য কিছু কিছু প্রত্যন্ত সীমায় আখ, তামাক, চা ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাই ও সরিষার চাষও ঐ সকল অঞ্চলে হইয়া থাকে।

দক্ষিণ ও পূর্ব মেদিনীপুরে ধান, পাট, শণ ইত্যাদিও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উন্নত কৃষি-ব্যবস্থার পূর্বে পশ্চিমবংগে সাবেকী উপায়ে প্রধানত দুই প্রকারের ধান চাষ হইত—**আমন** ও **আউস**। আমন ধান জুন-জুলাই মাসের দিকে রোয়া হয় এবং নভেম্বর হইতে জানুয়ারির মধ্যে ফসল উঠান হয়। অনেকটা খারিফ্ ফসলের মত। **আউস** বা **ভাদোই** ধান অতি অল্প সময়ে ফলে। মৌসুমী বৃষ্টি নামার বেশ পূর্বে এই ধানের চাষ হয় বিশেষভাবে প্রথমের দিকে যখন কালবৈশাখীর ঝড় ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাটি নরম হয় সেই সময় অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে আউস ধান চাষ হয়। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই ফসল কাটা হয়। কোন কোন অঞ্চলে গ্রীষ্মের দিকে সাবেকী **বরোধান** (লাঠিশাল) চাষ হইয়া থাকে। অবশ্যও তাহার পরিমাণ যথেষ্ট কম।

ব-দ্বীপ অঞ্চলে অনেকে ধানের পরিবর্তে পাট চাষ পছন্দ করিয়া থাকেন। কেননা তাহাতে নগদ টাকা পাওয়া যায়। মাটি ও বৃষ্টিপাতের ধরনের উপর পাট চাষ নির্ভর করে বলিয়া বিশ্বের বাজারে পাটের চাহিদা আছে।

পাট ঃ ভারত বিভাগের ফলে প্রধান পাট উৎপাদনের অঞ্চলগুলি বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ হইলেও বর্তমানে ভারত পাট উৎপাদনে পিছাইয়া নাই। পশ্চিমবংগে পাটজাতীয় **ম্যাসতা** (Mesta—একপ্রকার দীর্ঘ ও কর্কশ তন্তু জাতীয়) প্রচুর উৎপন্ন হইতেছে। সমগ্র ভারতে প্রায় ১০৬টি পাটের কলের

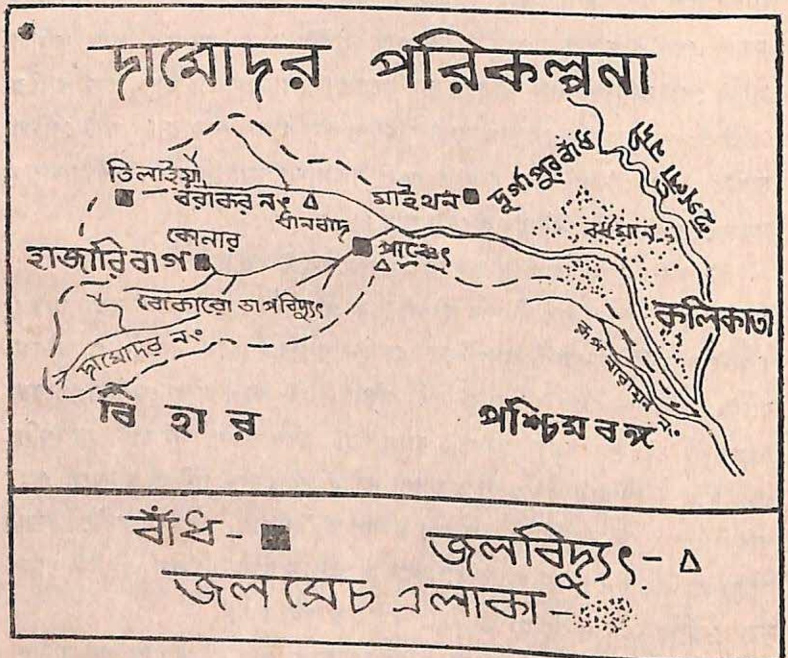
জন্য বৎসরে ৭২ লক্ষ গাঁট পাট ও ম্যাসতার প্রয়োজন। ইহার মধ্যে প্রায় ৯০টি বড় কল ও কয়েকটি ছোট কল হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। যাহা হউক এই পাট সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে উৎপন্ন হয়—ইহার জন্য প্রয়োজন পলিমাটি ও প্রচুর বারিপাত (৬০"-৭০")। পশ্চিমবংগে মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪-পরগণা, মূর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়িতে পাট উৎপন্ন হয়। পার্বত্য লালমাটি ছাড়া এখন পশ্চিমবংগে সর্বত্র পাটের চাষ বাড়িয়াছে। অনেকে পাট তুলিয়া লইয়া সেই জমিতে আমন ধানের চাষ করেন। পাটকে পচাইয়া তন্তু বাহির করিতে হয়। তাহার জন্যও যথেষ্ট পরিমাণ জল থাকা দরকার। পাট বেচিয়া চাষীরা নগদ টাকা পায় যাহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। স্থানীয় মানুষ তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা পায়।

উপকূলবর্তী অঞ্চলে কাজু বাদাম ও নারিকেল উৎপন্ন হয়।

পশ্চিমবংগের পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলটুকুকে স্বাভাবিকভাবে পৃথক করা যায়। একদিকে ভাগীরথী-হুগলী অপরদিকে ছোটনাগপুরের দুমড়ে যাওয়া প্রত্নজীবক যুগের মাকড়া পাথরের সারির মধ্যবর্তী অঞ্চল। এই অঞ্চল অবশ্য ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে উদ্ভূত অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই নদীগুলি প্রবাহিত। তাহারা ধীরে ধীরে হুগলী নদীর মোহনায় পতিত হইয়াছে এবং পশ্চিমবংগের পশ্চিম সীমান্তকে সুজলা করিয়া রাখিয়াছে। এইসব নদীতে বন্যা হইয়া থাকিলেও নূতন করিয়া ব-দ্বীপ গড়িয়া উঠিতেছে না বলিয়া এই অঞ্চলকে **মৃত ব-দ্বীপ** (dead delta) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বার্ষিক গড়ে ৬০"। অত্যন্ত অনিয়মিত —কখনও বা প্রচুর বর্ষণ আবার কখনও বা অনাবৃষ্টি বা খরা এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। একই ধরনের মামুলি উৎপন্ন যেন এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। সম্প্রতি **দামোদর উপত্যকা** পরিকল্পনায় যেমন বিদ্যুৎশক্তির সদ্ব্যবহার করা হইতেছে, তেমনি অতিরিক্ত জল দ্বারা সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হইতেছে। বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা শিল্প ও গ্রামাঞ্চল আলোকিত হইতেছে। সম্প্রতি **কংসাবতী পরিকল্পনা**র মাধ্যমে নদীর নানা স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি করার ফলে পশ্চিমবংগের পশ্চিমাঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ বাড়িয়াছে। ইহা ছাড়া বর্ধমান, হুগলি, ২৪-পরগণায় জেলার কিছু অংশে গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপ খননের ফলে চাষের ধারা পরিবর্তিত হইতেছে। এই অঞ্চলের প্রধান শহর মেদিনীপুর, খড়্গপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, তাম্রলিপ্ত। এই

সকল শহরগুলি অতি প্রাচীন যুগ হইতে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। প্রধান শাসন হিসাবে অথবা বাণিজ্যিক গুরুত্বে এই শহরগুলির ভূমিকা কম ছিল না। সম্প্রতি রেলওয়ে শহর হিসাবে খড়্গপুরের প্রসিদ্ধি আছে। নানা শিল্প বিশেষত রেলের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈয়ারীর কারখানা আছে।



যাহাই হউক না কেন **গাংগেয় ব-দ্বীপ** অঞ্চলকে মোটামুটি ভাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) **অপরিবর্তিত ব-দ্বীপ** (Moribund) অঞ্চল—নদীয়া, যশোহরের অংশ এবং মুর্শিদাবাদের অংশ, ভাগীরথী, পদ্মা ও মধুমতী নদীর দ্বারা বেষ্টিত। আর দক্ষিণে ২৪-পরগণার সীমা বা বাংলাদেশের খুলনার দ্বারা সীমিত। নদীর বেগধারা অত্যন্ত সীমিত। এমন কী বন্যায়ও ঐ অঞ্চলে প্লাবিত হয় না। ঐ সকল অঞ্চলে কিছু কিছু **বিল** বা জলাশয়ও দেখা যায়।

(খ) **পরিণত ব-দ্বীপ** (Mature Delta): উত্তরের মৃত ব-দ্বীপ আয়তনের নিম্নাংশ ও সুন্দরবন অঞ্চলের উত্তরাংশ লইয়া যে বিস্তৃত নদী বিধৌত সমভূমি তাহাকে পরিণত ব-দ্বীপ বলা হয়। এখানেই নদীগুলি বেগবতী,

জোয়ার-ভাঁটার প্রভাব আছে এবং এখনও নদীতে যথেষ্ট পলি সঞ্চিত হয়। একদিকে **হুগলী**, অপরদিকে **মধুমতী** এই দুই নদী দ্বারা এই অঞ্চল বেষ্টিত।

(গ) **নব গঠিত বা জেগে উঠা ব-দ্বীপ** (Active Delta): পরিণত ব-দ্বীপের দক্ষিণে কলিকাতা হইতে পূর্বদিকে সারি সারি বিলের সীমারেখায় এই ব-দ্বীপ সূচিত হয়। এই বিলগুলি মাছের ঘেরী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনের বিরাট অংশ এই ব-দ্বীপ ভূমির অন্তর্গত।

বর্তমানের এই ব-দ্বীপ কতখানি সমুদ্রের দিকে সৃষ্টি হইতেছে ইহা লইয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। সমগ্র ব-দ্বীপ অঞ্চলের **মাটির** গঠনে নানা বৈচিত্র্য আছে। মৃত ব-দ্বীপ অঞ্চলের মাটিতে বালুর পরিমাণ বেশী আর সুন্দরবনের মাটি বালিকণাযুক্ত এবং লবণাক্ত। মাটির ধরনের জন্য কৃষি-কার্যেরও তফাৎ হইয়া থাকে। প্রায় সর্বত্র ভাল আমন ধান উৎপন্ন হয়।

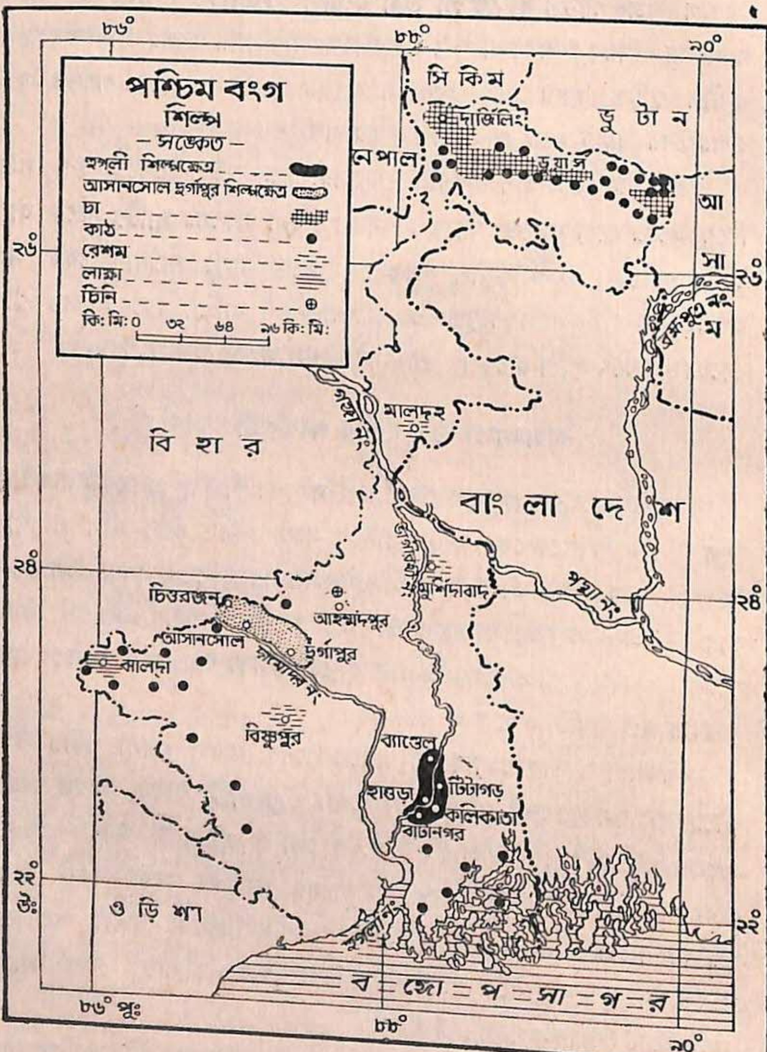
কলিকাতা ও হুগলীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকার্যের পর কলিকাতা দীর্ঘদিন ভারতের রাজধানী ছিল। কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় অঞ্চল হইতে কাঁচা মাল সংগৃহীত হইত। ফলে কলিকাতা বন্দর বৃটিশ আগমনের পর হইতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। ১৬৯২-৯৪ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক এই স্থানে বাণিজ্যের জন্য দুর্গ নির্মাণ করেন। অবশ্য মারাঠাদিগের উৎপাত হইতে কলিকাতার ব্যবসা কেন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য মারাঠা খাল খনন করা হয়।

কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিশেষ করিয়া হুগলী নদীর উভয় তীরে বহু কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। **নৈহাটি** হইতে আরম্ভ করিয়া **বজবজ** পর্যন্ত অঞ্চলে পাটকল রহিয়াছে, হাওড়া ও ভাটপাড়া অঞ্চলে এগুলির সংখ্যা অনেক বেশী। যদিও ভারত বিভাগের পর এই কারখানাগুলি যথেষ্ট পরিমাণ পাটের অভাবে নানা অসুবিধায় পড়িয়াছিল। আবার অন্যদিকে বিশেষ করিয়া আসানসোল-রানীগঞ্জ-দুর্গাপুর অঞ্চলে কয়লাকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিরাট শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই শিল্পাঞ্চল ও নগরকেন্দ্রিক জীবন ধারায় স্থানীয় জন-জীবনের এক চিত্র প্রতিফলিত হয়। গ্রামজীবনে ঋতুভেদের বৈচিত্র্য ও কর্মতৎপরতার প্রভাব এখানে শিথিল। গ্রীষ্মের দিনে চাষের কাজ আরম্ভ, আবার বর্ষায় পুরাদমে চাষ, হেমন্ত অথবা শীতে ফসল তোলার পালা। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন

ধরনের কাজের উদ্যোগে জীবনের এক তাৎপর্য চোখে পড়ে। শুধু তাই নয়, কর্মক্লান্ত মানুষ চাষের কাজের শেষে আবার নানাবিধ উৎসব ও আনন্দের



মাঝে তাহাদের জীবনের নানাদিক রাঙাইয়া লয়। সেইজন্য পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সময়ে নানারকম মেলা বা বারোয়ারি পূজা ঐ সময়ের বৈশিষ্ট্য। নগরকেন্দ্রিক জীবনে গ্রামজীবনের ছেদ পড়িয়াছে। এখানে

মেহনতী মানুষের বা খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের জীবনে কলকারখানায় হুইসেলের শব্দ তাদের বিভিন্ন সময়ে কাজে যোগদান করিতে বাধ্য করায়, তাহাদের কাজে উৎসাহী করায়। এখানে ঋতুভেদের বৈচিত্র্যে কাজকর্মের বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। প্রয়োজনের তাগিদে উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের কর্মীর কর্মচঞ্চলতায় জীবন ভরপুর। পরিশ্রমের বদলে আসে নগদ টাকা—বা মূল্য আর গ্রামজীবনে আসে ফসল। নগদ মূল্য বা টাকায় ফসলের অংশ বা খাদ্য সংগৃীত হয়—উদরান্নের ব্যবস্থা হয়। গ্রাম-জীবনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কৃষিমজুর বা কৃষক উৎপন্ন ফসল পায়। কিন্তু নগর জীবনে তাহা সম্ভব নয়। অপরের ভোগ্য পণ্যের জন্য তাহাদের শ্রম—তাহাদের জীবিকা। আবার শহর ও নগর জীবনে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা আছে—সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা। গ্রামজীবনে যাত্রা ও মেলার মধ্যে যাহা সীমাবদ্ধ।

অনুশীলনী

১। গাংগেয় সমভূমি বলিতে কী বুঝায়? তাহাকে মোট কয়ভাগে ভাগ করা যায় তাহার বিবরণ দাও।

২। দোয়াব অঞ্চলের চাষের বিবরণ দাও।

৩। উত্তরপ্রদেশের প্রধান শহর কী কী?

৪। উত্তরপ্রদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজ সামগ্রীর বিবরণ দাও।

৫। মধ্যভাগের পলিময় গাংগেয় সমভূমির একটি বিবরণ দাও। ঐ অঞ্চলের প্রধান শস্য কী কী?

৬। গংগা বাঁধ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৭। নিম্নবংগের পলিময় সমভূমির এক ধারাবাহিক বিবরণ দাও।

৮। সম্প্রতি কোথায় কোথায় পাট চাষ হয় তাহার বিবরণ দাও। পাট চাষ কী ভাবে হয়?

৯। পরিণত ব-দ্বীপ বলিতে কী বুঝায়?

১০। কলিকাতা ও হুগলীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

১১। শিল্পাঞ্চল বা নগরকেন্দ্রিক জীবনধারার সংগে গ্রাম জীবনের তুলনামূলক ভাবে আলোচনা কর।

১২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:

(ক) খড়্গপুর; (খ) মৃত ব-দ্বীপ; (গ) ঘূর্ণিঝড়

১৩। গংগা নদীর উৎস হইতে সমুদ্র পর্যন্ত মানচিত্র অংকন কর।

৪ মরু অঞ্চল

বিস্তীর্ণ স্বাভাবিক শুষ্ক বালুকাময় অঞ্চলই মরুভূমি। ভারতের প্রায় ৩·২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অংশ তপ্ত মরু অঞ্চলের অন্তর্গত। বিশেষভাবে পশ্চিমাঞ্চলের দিল্লির শৈল শিরা এবং সিন্ধু অববাহিকার পূর্বদিকের বালুকাপূর্ণ ভূখণ্ডই ভারতের প্রধান মরু অঞ্চল। আরাবল্লী পর্বতমালা পশ্চিমের অঞ্চল (২৫৯,০০০ বর্গ-কিলোমিটার) **থর মরু** বলিয়া পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে রাজপুতানার মরুভূমির বিস্তৃতি রাজস্থান, গুজরাট, এবং হরিয়ানা রাজ্যে। ভারতের অন্যান্য অংশেও কিছু কিছু শুষ্ক তপ্ত মরু অঞ্চল দেখা যায়।

ছক—৩

ভারতের শুষ্ক তপ্ত মরু অঞ্চলের বিবরণ

রাজ্য	শুষ্ক/মরু অঞ্চল বর্গ কিলোমিটার	রাজ্যের মোট অঞ্চলের শতাংশ
১। রাজস্থান	১৯৬,১৫০	৬১·০
২। গুজরাট	৬২,১৮০	১৯·৬
৩। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা	২৭,৩৫০	৯·০
৪। মহারাষ্ট্র	১২,০৯০	০·৪
৫। কর্ণাটক	৮,৫৭০	৩·০
৬। অন্ধ্র প্রদেশ	২১,৬০০	৭·০

রাজস্থান রাজ্যের, যোধপুর, জয়সালমের জেলায় থর মরুর তপ্ততা সহজেই অনুভব করা যায়। সংলগ্ন এলাকা বলিয়া পাকিস্তানের পূর্বাংশে এই মরু বিস্তৃত

রহিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের বায়ু-প্রবাহের ফলে স্থানে স্থানে বালুকারাশি প্রায় ৫০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ। এই বালুকারাশির নীচে রহিয়াছে বালুকাময় শিলা। যোধপুরের সন্নিকটে গ্রানাইট পাথরের তলভূমি দেখা যায়, যাহা খুব সম্ভব আরাবল্লী পর্বতমালার অংশ। খয়েরপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে কর্দমের নীচে জলের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। কোথাও কোথাও ঐ জল লবণাক্ত আর ভূপৃষ্ঠের আচ্ছাদন হিসাবে দেখা যায় এক প্রকার ঘাসের আবরণ। এই মরু অঞ্চলে কয়েকটি স্বাভাবিক জলাশয় বা হ্রদ আছে। সেগুলির মধ্যে **সম্বর** হ্রদ প্রধান।

মরুভূমির দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অতি সামান্য বলিলে চলে, বৎসরে গড়ে ১০" বা ২৫৪ মিলিমিটার। জলবায়ু **চরম** বা মহাদেশীয় প্রকৃতির অর্থাৎ শীত-গ্রীষ্ম বা রাত্রিদিনের তাপমাত্রার পার্থক্য যথেষ্ট। তপ্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু-



প্রবাহের ফলে উত্তর-পশ্চিম রাজস্থানে অত্যন্ত গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। মরু অঞ্চলের কোথাও কোথাও ৪৮° সেন্টিগ্রেড হইতে ৫২° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠে। আবার সন্ধ্যার পর তাপমাত্রা হঠাৎ কমিতে আরম্ভ করে।

গ্রীষ্মকাল অত্যন্ত পীড়াদায়ক। গ্রীষ্মের দিনে অনেক সময় দক্ষিণ-পশ্চিমী বায়ু-প্রবাহের জন্য ঝড় হয়। এই ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ১৩৬ কিলোমিটার। এই বালুকারাশির ঝড়ের জন্য যাতায়াত প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। অত্যধিক তাপমাত্রার জন্য বৃক্ষাদির পরিমাণ একেবারে নাই। মরু অঞ্চলের দক্ষিণে কোথাও কোথাও মৌসুমী বায়ুপ্রবাহে কিছু বৃষ্টিপাত হয়—ইহার ফলে কোথাও কোথাও ঐ সময় ঘাস জন্মায়। কোথাও খর্বাকৃতি বাবলা গাছের অবিস্তীর্ণ পরিবেশ রহিয়াছে।

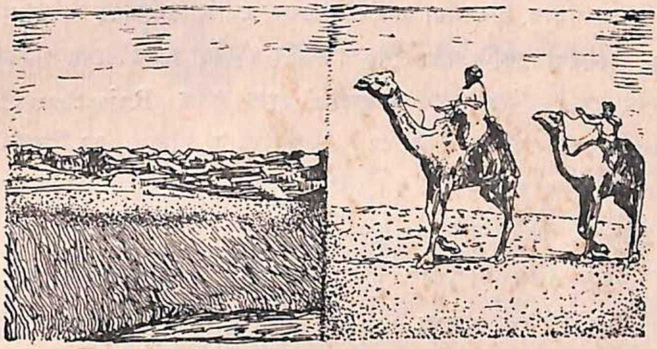
মরু অঞ্চলের বিস্তৃতি সম্পর্কে এবং ঐ অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিয়া মনুষ্য বাসোপযোগী করিবার জন্য যোধপুরে একটি কেন্দ্রীয় শুষ্কাঞ্চল গবেষণা কেন্দ্র (Central Arid Zone Research Institute) স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের এই শুষ্ক মরু অঞ্চল সম্পর্কে নানা বিতর্ক রহিয়াছে। অনেকের ধারণা মানুষ তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ ও অরণ্যরাজিকে যথেষ্ট নষ্ট করিবার জন্য এই মরু অঞ্চলের সৃষ্টি। উত্তর-পশ্চিম রাজস্থানে নানাস্থানে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে খৃস্টপূর্ব ২০০০ বৎসরের **হরাপ্পা সংস্কৃতির** নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

মরুভূমি ও জীবনযাত্রা

এই মরু অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এক একটি গ্রাম অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন। সাধারণত প্রাকৃতিক কোন জলাশয়ের নিকট অবস্থিত। একটি গ্রাম হইতে অপর গ্রামের দূরত্ব অনেক সময় ৫০ কিলোমিটার। বিকানীর ও যোধপুর অঞ্চলে কিছু কিছু হ্রদ থাকায় জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার ঐ অঞ্চলে নিয়মিত বর্ষা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া অধিবাসীরা অর্ধ যাযাবরের জীবনধারায় অভ্যস্ত। অর্থাৎ তাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনিশ্চয় খাদ্য-সন্ধান তাহাদিগকে যাযাবর করিয়া তুলিয়াছে। যে কয়টি গৃহপালিত পশু আছে তাহা লইয়া তাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। তবুও অধিবাসীদের জীবনে মরুভূমির এমন এক আকর্ষণ আছে যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা আবার তাহাদের পুরাতন গ্রামে ফিরিয়া আসিতে চায়।

শুষ্ক মরু অঞ্চলে কৃষিকাজ কোনমতেই সহজ বা অনায়াসলব্ধ নয়। সেইজন্য ঐ অঞ্চলের মানুষকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করিয়া বাঁচিতে হয়। যে সকল

অঞ্চলে কৃষির কিছুটা সুবিধা হয়। যে সকল অঞ্চলে কৃষির কিছুটা সুবিধা আছে সেখানে উটের সাহায্যে লাঙল দেওয়া হয়। রাজস্থানের বেশীর ভাগ লোককে জোয়ার, বাজরা, যব ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে হয়। উটের সাহায্যে যাতায়াত চলে। কেবল কৃষিকার্য নহে যাতায়াত বা অন্যান্য কাজের জন্য উটের ব্যবহার আছে। কেননা উট দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জল ব্যতীত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। উট ছাড়া রাজস্থানে প্রচুর ভেড়া প্রতিপালিত হয়।



উটের পিঠে মরুভূমি পার হওয়া

অর্ধ যাযাবর গোষ্ঠীগুলি ভেড়ার পাল লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ভারতের গৃহপালিত পশুর প্রায় ৫৬% শতাংশ উট, ২% ভেড়া রাজস্থানে বিদ্যমান। সম্প্রতি রাজ্য সরকার নানাভাবে **সংকর উট** প্রচলন করিয়াছেন। ফলে প্রায় ১২ রকমের সংকর উট দেখিতে পাওয়া যায়। **বিকানীর উট** ভার বহনে বিশেষ পটু। রাজস্থানের ভেড়ার লোম হইতে সারাভারতে সংগৃহীত প্রায় ৪৫% শতাংশ পশম সংগৃহীত হয়। সাধারণত ঐ পশমের পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ কিলোগ্রাম। পশম কম্বল বা পোশাক এবং কারপেট তৈরীর বিশেষ উপযোগী। সম্প্রতি আলোয়ারে রাজ্য সরকার একটি শূকর প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। বৎসরে অন্তত ১৫ লক্ষ ভেড়া অন্যান্য রাজ্যে চালান যায় এবং তাহাতে ১০ লক্ষ মানুষ জীবিকা অর্জন করে।

দীর্ঘদিন ধরিয়া সাবেকী প্রথার চাষ রাজস্থানে প্রচলিত। মরুভূমির উত্তরভাগে বিকানীর ও গংগানগর জেলায় জলসেচের ব্যবস্থা হওয়ায় কৃষিকার্যের কিছুটা ব্যাপকতা লক্ষ্য করা গিয়াছে। **রাজস্থান খাল খনন** প্রকল্প হইতে উপযুক্ত জল পাওয়া গেলে মরু অঞ্চলের অনেক অংশ কৃষিকার্যের উপযোগী হইবে। তাছাড়া **ভাক্‌রা প্রকল্প** হইতে বেশ পরিমাণ জল ৩,২০,০০০

হেক্টর জমিকে সিক্ত করিয়া চাষের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছে। মরু অঞ্চলের প্রধান শস্য হইল **জোয়ার** ও **বাজরা**। যৎ সামান্য আখ ও তুলা হয় তাহা হইতে উৎপাদকরা নগদ টাকা পায়। গংগানগর জেলায় **সুরতগড়ে** রাশিয়ার অর্থসাহায্যে একটি উন্নত কৃষিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত (১৯৫৬ খৃঃ) হইয়াছে।

অনুন্নত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভীল উপজাতিই প্রধান। তাছাড়া গোড়ালিয়া লোহার, বানজারা প্রভৃতি অনেক গোষ্ঠী রহিয়াছে। নানাভাবে শুষ্ক মরু অঞ্চলের প্রকৃতি পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাইয়া জনজীবনের পরিবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে। বিশেষভাবে **রাজস্থান খাল** প্রকল্প (Rajasthan Canal Project) সম্পূর্ণ হইলে প্রায় ৫২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৪৫ কিলোমিটার প্রস্থ মরু-অঞ্চলকে কৃষিকার্যের উপযোগী করা সম্ভব হইবে। ফলে জনগণের যাযাবর বৃত্তির পরিবর্তন ঘটিয়া তাহারা স্থায়ী কৃষকে পরিণত হইবে। সরকারী প্রচেষ্টায় এই সকল যাযাবর গোষ্ঠীকে স্থায়ী করিবার বিশেষ আয়োজন চলিতেছে। পাঞ্জাবের **শতদ্রু** ও **বীয়জ** নদী হইতে এইখানে জল আসিবে। ভারত-পাকিস্তান সীমারেখার সমান্তরাল থাকিয়া এই খাল পাঞ্জাব ও রাজস্থানের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। ইহা ছাড়া **মাহী** প্রকল্পে বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাইবে। তাহার ফলে শিল্পের প্রসার ঘটিবে। কৃত্রিম অরণ্য সৃষ্টির মাধ্যমে বালুকা ঝড়ের প্রকোপকে ঠেকাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। **জইসালেমের** জেলায় কৃত্রিম অরণ্য ও পশু খাদ্যের জন্য চারণভূমি সৃষ্টির ব্যবস্থা হইয়াছে। মোটকথা মরুভূমিকে কেন্দ্র করিয়া যে জনজীবনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছিল নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে তাহার পরিবর্তন ঘটিতেছে। এককথায় অর্ধ যাযাবর বৃত্তির বিলোপ ঘটিয়া স্থায়ী কৃষকের গ্রাম গড়িয়া উঠিবে।

অনুশীলনী

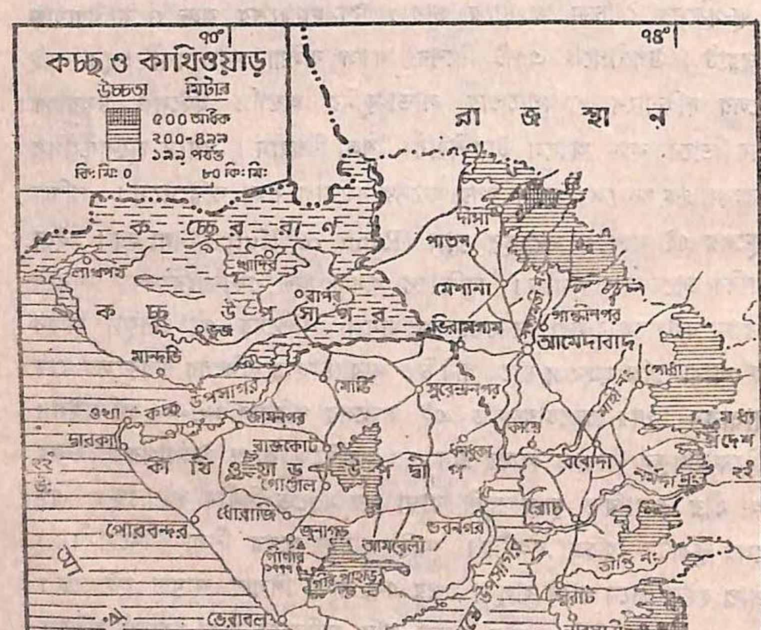
১। ভারতের প্রবীণ মরু অঞ্চল কোথায়, তাহার বর্ণনা দাও।
২। অধিবাসীদের জীবনে মরু অঞ্চলের প্রভাব বর্ণনা কর।
৩। CAZRI কী? তাহাদের প্রধান কাজ বর্ণনা কর।
৪। শুষ্কাঞ্চলকে শস্যশ্যামল করিবার জন্য কী কী পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইতেছে।
৫। মরু অঞ্চলের প্রধান শিল্প কী? তাহার বিবরণ দাও।
৬। মরু অঞ্চলের গৃহপালিত পশুগুলির বিবরণ দাও। তাহারা কী কাজ করিয়া থাকে?

৫ কচ্ছ ও কাথিয়ায়াড় উপদ্বীপ

ভূ-গঠনের বৈচিত্র্য অনুসারে ভারত উপমহাদেশের কচ্ছ ও কাথিয়ায়াড় (গুজরাট) উপদ্বীপকে একটি বিশেষ অঞ্চল বলিয়া গণ্য করা হয়। এই অঞ্চলের দক্ষিণাংশ দাক্ষিণাত্যের লাভা-ভূমির অন্তর্গত হইলেও উত্তরাংশ বিশেষ ভাবে কচ্ছ অঞ্চলে টারশিয়ারী শিলা বিদ্যমান। স্থানে স্থানে ভংগিল উপত্যকা এক অঞ্চলের সংগে অপর অংশের সংযোগ রক্ষা করিতেছে। পশ্চিম উপকূলের এই অংশকে **কচ্ছের রান** (Rann of Kutch) বলা হয়। ইহা স্বাভাবিক ভাবে অত্যন্ত নীচু। ভূমিকম্প অথবা অন্য কোন নৈসর্গিক কারণে এই রকম ঘটিয়াছে বলিয়া অনেকের অনুমান। পশ্চিমের এই উপকূল দক্ষিণ দিকে গোয়া পর্যন্ত **কংকন** নামে পরিচিত আর তাহার দক্ষিণের উপকূলের নাম **মালাবার**। প্রায় চতুষ্কোণাকৃতি এই অঞ্চলের পরিমাণ ৪৬,০০০ বর্গ মাইল। একদিকে উপকূল বিধৌত কচ্ছের রান এবং অন্যদিকে কাম্বে উপসাগর। উত্তর দিকে ধীর প্রসারিত ধূসর ভূমি যাহা থর মরুতে বিলীন হইয়াছে। এই অঞ্চলের ভূ-গঠন বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। অতি প্রাচীন যুগের শিলা (মিয়োসীন) ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া স্থানে স্থানে বালুকা প্রস্তর এবং লাভা শিলায় আবৃত হইয়াছে। কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন নীচু অংশে পলি জমিয়াছে যাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অন্য দিকে সম্পূর্ণ কাথিয়ায়াড় অঞ্চল দক্ষিণের লাভা-শিলার উপর গঠিত হইলেও মধ্যে মধ্যে পরিখার মত অংশ আছে। অত্যন্ত প্রাচীন শিলার উপর এই লাভা স্তর অবিন্যস্ত ভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কোথাও রহিয়াছে বালুকা-পাথর। **দ্বারকা** ও **ভাবনগরের** মধ্যবর্তী প্রায় ২০-৩০ মাইল পর্যন্ত অঞ্চল বাত্যাবাহিত বালুরাশিতে পূর্ণ। ইহা জমিয়া এক রকম শিলায় পরিণত

হইয়াছে। গৃহ নির্মাণের কাজে এই শিলা ব্যবহৃত হয় এবং এই শিলা **পোরবন্দর শিলা** নামে পরিচিত। যদিও এই কাথিয়াড় অঞ্চল অত্যন্ত নীচু তবুও উত্তরে অনুচ্চ রাজকোট পাহাড় শ্রেণী (১১০০ ফুট) আর দক্ষিণে **গির** পাহাড় শ্রেণী (২১০০ ফুট) থাকিয়া এই অঞ্চলকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। গির অরণ্যে সিংহকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়।

এই অঞ্চল প্রায় শুষ্ক, পশ্চিমে মৌসুমী বাতাসের প্রভাব আছে। বেশীর ভাগ অঞ্চলই এক প্রকার তৃণ ও গুল্ম দ্বারা আচ্ছাদিত যদিও গির ও গিরনার পাহাড় শ্রেণী অনুচ্চ কণ্টক জাতীয় বৃক্ষে পূর্ণ। উপকূল অঞ্চলে খয়ের এবং আম গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।



কৃষিকার্য এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। কচ্ছের অধিবাসীদের অনেকে পশুপালনের উপর গুরুত্ব দেয়। এক দিকে পাহাড় ও

অনুর্বর মাটির অঞ্চল বলিয়া স্বাভাবিক কৃষির অসুবিধা রহিয়াছে, আবার অন্য দিকে উপকূল অঞ্চল লবণাক্ত। সেইজন্য মোটামুটি প্রধান কৃষি-অঞ্চলগুলি পাহাড়ের পাদদেশ অথবা পলিপূর্ণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। সম্পূর্ণ বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া এই অঞ্চলে কৃষিকার্য চলে না—কূপ, বাঁধ, পুকুর বা জলাশয়ে যে জল সঞ্চিত থাকে তাহাতে কৃষির কাজ চলে। ইহার ফলে এই অঞ্চলের প্রায় ৫০% অংশে আবাদ হয়। কাথিয়াড়ের পূর্বাংশে গোহিয়ার্ড এবং নল অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত হইলে সময়ে সময়ে ঐ অঞ্চল প্লাবিত হয়। ক্যাম্বে উপসাগরের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে তলাকার জল লবণাক্ত এবং মাটিতে বালিরাশির পরিমাণ বেশী। কিন্তু অভ্যন্তরের অঞ্চলে বালির ভাগ কম বলিয়া গম, বাজরা, জোয়ার ও তূলার চাষ হইয়া থাকে। দক্ষিণের সুরাট অঞ্চলে কৃষিকার্যে সমতা নাই। পলি অঞ্চলে যেমন ভাল কৃষিকার্য হয় আবার পাথুরে মাটির অঞ্চল প্রায় পতিত পড়িয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত উর্বর ভাদর অঞ্চলে কেবল বাজরা, জোয়ার উৎপন্ন হয় না, নানাবিধ তৈলবীজ এবং তূলা প্রধান পণ্য-শস্য।

দ্বারকা ও হালর উপকূলবর্তী অঞ্চলের মাটিতে চুনাপাথর দেখা যায়। অনুর্বর এই অঞ্চলে কৃষিকার্য অপেক্ষা পশুপালনই প্রধান উপজীবিকা বলিয়া গণ্য। এখানের গ্রামগুলি ছড়াইয়া থাকিলেও উর্বরাঞ্চল ও পানীয় জলের নিকটে অবস্থিত এবং সুসংবদ্ধ। কচ্ছ গুজরাটের একটি জেলা। এই জেলার প্রধান বন্দর হইল মান্‌ভি। জেলার প্রধান শহর হইল ভুজ। টুনা বন্দর হইতে ভুজ পর্যন্ত মিটার গেজ রেল লাইন আছে। কাথিয়াড়ের উপকূল আরব, পোর্তুগীজ ও আফ্রিকার অনেক গোষ্ঠীর লোকের প্রথম পদার্পণের স্থান বলিয়া পরিচিত। **ওখা, পোরবন্দর, ভাবনগর** প্রভৃতি এই অঞ্চলের বন্দর। এই বন্দরগুলির সহিত **আমেদাবাদ** পর্যন্ত রেলপথে সংযুক্ত। স্থানীয় তূলা ও তৈলবীজ হইল প্রধান শিল্প পণ্য। অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্যে **জামনগর** অন্যতম। জুনাগড়, রাজকোট প্রভৃতি অঞ্চলে গুজরাটের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে।

অনুশীলনী

১। কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়কে এক বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল বলা হয় কেন?

২। কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু বর্ণনা কর।

৩। অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কী?

৪। সঠিক উত্তর দাও:

(ক) বাড়ী তৈরীর জন্য কাথিয়াবাড় হইতে একপ্রকার পাথর আসে—পোরবন্দর শিলা, চুনাপাথর, মারবেল পাথর।

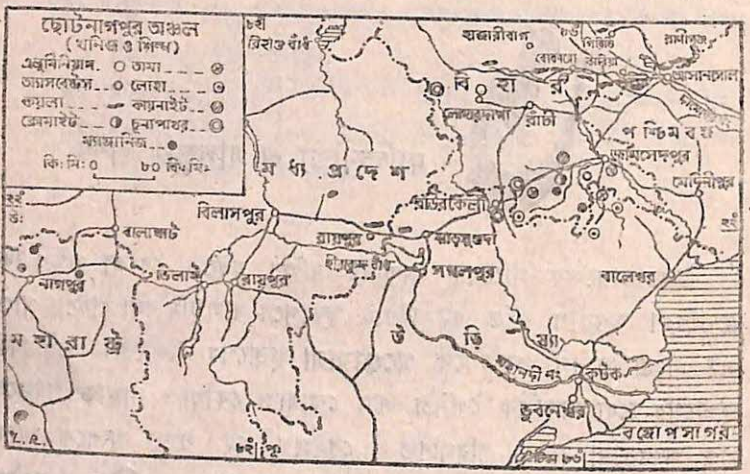
(খ) গির অরণ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় অনেক বন্য জন্তু দেখা যায়—সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক।

(গ) দ্বারকা অঞ্চলের মাটি চাষের উপযোগী নয় বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীর উপজীবিকা—গৃহনির্মাণ, পশুপালন, শিল্পকাজ।

৬ দাক্ষিণাত্য ও মালভূমি অঞ্চল

উত্তর ভারতের গাংগেয় সমভূমির দক্ষিণ হইতে সোজা দক্ষিণ দিকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এই বিরাট ভূভাগকে মালভূমি বলা যাইতে পারে। এই সমগ্র ভূভাগ প্রকৃতপক্ষে **গণ্ডোয়ানা** ভূভাগের অন্তর্গত। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং কোথাও কোথাও পাহাড় পর্বতশ্রেণী এক অন্তঃসীমা বলিয়া পরিগণিত। সেইজন্য এই সম্পূর্ণ অংশকে আবার কতকগুলি অংশে যেমন **মধ্যভারত মালভূমি** বা **মালব, কর্ণাটক** বা **মহীশূর মালভূমি, দাক্ষিণাত্য, তেলেংগানা** ও **ছোটনাগপুর** মালভূমিতে ভাগ করা যাইতে পারে। বাস্তবিকই ভারতের মধ্য অংশে বিন্ধ্যপর্বত, পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার উত্তরে এবং আরাবল্লী পর্বতের পূর্বদিকের বিস্তৃত মালভূমিই মধ্যভারত মালভূমি। আবার ইহার পশ্চিমাংশের নাম **মালব**। মধ্য অংশকে বুন্দেলখণ্ড এবং পূর্বদিকের বিস্তৃত অঞ্চলই ছোট নাগপুরের মালভূমি বলিয়া খ্যাত। এককথায় এই বিস্তৃতি জামসেদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত যেখান হইতে দামোদর উদ্ভূত। আবার এই অঞ্চলই মহানদীর উত্তরাংশ বা ওড়িশার অরণ্যাকীর্ণ লাল কাঁকুরে মাটির সংগেও এক। পূর্বাঞ্চলের **জামসেদপুর** অঞ্চলের গুরুত্ব অনেক। কেননা জামসেদপুর অঞ্চলের নিকটে একদিকে যেমন **সঞ্জয়, খড়কাই** ও **সুবর্ণরেখা** নদীগুলি উদ্ভূত হইয়াছে তেমনি এই জামসেদপুর সিংভূমকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের প্রধান লৌহ আকরগুলি বিদ্যমান। এই লৌহ আকরও বিহার-বর্ধমান অঞ্চলের কয়লা খনিগুলি মিলিয়া বিরাট এক শিল্পাঞ্চল গড়িয়া ভারতের সমৃদ্ধি রচনা করিয়াছে। ইহার প্রভাবে হুগলী নদীর তীরবর্তী কলকারখানাগুলি সজীব ও চঞ্চল। **ঝরিয়া** অঞ্চলের **ফায়ার ক্লে,** মানভূম অঞ্চলের **সিলিকা** (Silica), **ঘাটশিলা**

ও **মানভাণ্ডার** অঞ্চলের **তামার খনি**ও এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। আবার অন্যদিকে **মুড়ি** অঞ্চলের **বক্সাইট** ইহার নিকটবর্তী অঞ্চল। পশ্চিম মধ্য-প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বা ওড়িশা হইতে **ম্যাংগানীজ** পাওয়া যায়। এই সকল খনিতে কাজ করিবার জন্য যে বিরাট শ্রমশক্তির প্রয়োজন পার্শ্ববর্তী



অঞ্চলের আদিবাসীরাই সাধারণত সেই চাহিদা মিটায়। ফলে কিছু পরিমাণে স্বল্প ব্যয়ে আকরগুলি হইতে সংশোধিত ধাতু পাওয়া যায়। জামসেদপুর **টাটানগর** লৌহ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র এবং সম্প্রতি দুর্গাপুরও এবিষয়ে যথেষ্ট অগ্রণী। **রাউরকেলা, ভিলাই, বোকারো** প্রভৃতি কারখানা সরকারী উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আমাদের দেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি রাঁচির নিকট জাপানের সাহায্যে একটি চীনা মাটির বাসন তৈরীর কারখানা খোলা হইয়াছে। আবার ঐ সকল শিল্পাঞ্চলের অন্যান্য অধিবাসীদের নিত্যনৈমিত্তিক চাহিদা মিটাইবার জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাগান বাগিচা ও শব্জীর উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ছোটনাগপুরের এই মালভূমিতে কতকগুলি ছোটবড় পাহাড় রহিয়াছে। তাহার মধ্যে **পরেশনাথ** পাহাড় উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫০"-৬০"। ঢেউ খেলান পাহাড়গুলির তলদেশে ভূমি হইল উপযুক্ত কৃষিযোগ্য জমি। ঐ সকল জমি খুব সরস এবং অতি অনায়াসে কুয়া কাটিলে জল পাওয়া যায়। আর পাহাড়ের গায়ে রহিয়াছে শাল, পিয়াশাল, মহুল, আসন কেঁদ, কুল, পলাশ প্রভৃতি গাছ। **আসন, কুল** প্রভৃতি গাছে

গুটিপোকার চাষ হয়। **পুরুলিয়া** অঞ্চলে **লাক্ষা**ও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। মহুল হইতে তেল এবং মদ তৈয়ার হয়। কয়েকটি প্রধান পার্বত্য শহরকে বাদ দিলে বেশীর ভাগ অরণ্যে বা অরণ্যের পাদদেশে উপজাতি গোষ্ঠী বিশেষ ভাবে সাঁওতাল, ওঁরাও, ভূমিজ, মুণ্ডা, কোড়া, জুয়াং, বিরহড়, মালের, অসুর প্রভৃতির বাস। অরণ্যনির্ভর এই উপজাতি গোষ্ঠীগুলি পরিবেশ পরিমণ্ডলের সংগে অভিযোজন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। কোন কোন সময়ে যেমন অরণ্যে শিকার করে অথবা কেন্দ গাছের পাতা হইতে বিড়ি তৈয়ার করে, শালপাতা দিয়া খাবারের ঠোঙা বা পাত্র তৈয়ার করে অপরদিকে নানারকম শাকশব্জী চাষ করিয়া নিজেদের এবং স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করে। গরু, মহিষ, শূকর, মোরগ ইত্যাদিও যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিপালিত হয়। ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষের অনুপ্রবেশের ফলে এই মানুষগুলির জীবন যাত্রার যে পরিবর্তন ও চাহিদা আসিল তাহা মিটাইবার জন্য ইহাদের অনেকে শহরের দিকে আসিল নূতন কর্মসংস্থানের আশায়। ইহাদের অনেকে উত্তরবংগ ও আসামের চা-বাগিচায় কাজের জন্য চলিয়া গিয়াছে। কেননা ইহারা শারীরিক শ্রমে বিশেষ পটু। ইহাদের অনেকে নীল চাষ করিবার সময় কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছিল, আর অনেকে সুন্দরবন অঞ্চলের আবাদে চাষ করিবার জন্য আসিয়া ঐ অঞ্চলে স্থায়ী হইয়া গিয়াছে।

মধ্যভারতের **মহাকাল** পাহাড় এবং ওড়িশার পাহাড়শ্রেণীর মধ্য দিয়া বিস্তৃত ছত্তিশগড় অঞ্চল। উচ্চ মহানদীর উত্তরের এই অংশ আবার অন্যদিকে ছোটনাগপুরের পাহাড় দিয়া ঘেরা। মারাঠা আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চল অনেকটা অনুপদ্রুত ছিল। প্রধান বাসিন্দা ছিল গন্ড উপজাতি। এই অঞ্চলের প্রধান শহরগুলি হইল **রায়পুর, বিলাসপুর, ড্রুগ** প্রভৃতি। ঐ সকল অঞ্চলের উর্বর ভূমিতে ধান চাষ হয়। গ্রামগুল জলাশয় বা জলের উৎসকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই গ্রামগুলি অত্যন্ত সুসংবদ্ধ। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫৫"-৬০" ইঞ্চি। এই অঞ্চলের গ্রাম বা পল্লী অঞ্চলে নগর সভ্যতার ছাপ সুস্পষ্ট নয়।

ধীর বিচ্ছিন্ন এই মালভূমি পশ্চিমের দিকে বিস্তৃত। একদিকে দক্ষিণের লাভাময় অঞ্চল ও ওড়িশার কংকরাবৃত অরণ্যরাজি, আবার অন্যদিকে **মহাকাল** পাহাড়শ্রেণী ও **ছোটনাগপুরের মালভূমি**। এই অঞ্চলের জলবায়ু অনেকটা

চরম ভাবাপন্ন। সেইজন্য এই অঞ্চলে জোয়ার, ভুট্টা, বাজরা, কার্পাস নানা প্রকারের **তৈলবীজ** বিশেষ করিয়া **সুরগুজা** হইল প্রধান। ধীরে ধীরে এই অঞ্চল পশ্চিমে রাজপুতনার দিকে চলিয়া আসিয়াছে এবং গুজরাট অঞ্চলের কৃষ্ণমৃত্তিকার মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

গোদাবরী বা লাভা অঞ্চল

দাক্ষিণাত্যের এই মালভূমি বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঢালু। বিশেষভাবে **বিন্ধ্য, কাইমুর, রাজমহল** ও **পরেশনাথ** পাহাড় আর আরও পূর্ব দিকে বিস্তৃত সাতপুরা **মহাদেব, মহাকাল**। এই পার্বত্য অঞ্চল **প্রধান জল বিভাজিকা** বলিয়া উত্তরদিকে যেমন কয়েকটি নদী গংগার দিকে বহিয়া গিয়াছে আবার তেমনি মহানদী বহিয়া আসিয়াছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। এই মালভূমির পূর্বদিকে **পূর্বঘাট** (মলয়াদ্রি) পর্বতমালা দক্ষিণদিকে চলিয়া আসিয়াছে। আর পশ্চিমদিকে **পশ্চিমঘাট** (সয়াদ্রি) পর্বতশ্রেণী উত্তর-দক্ষিণে চলিয়া আসিয়াছে। পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণী মহীশূরের দক্ষিণে নীলগিরিতে মিলিত হইয়াছে। নীলগিরির সর্বোচ্চ পর্বত-শৃংগ **দোদাবেতা** (৮,৬৪০′)। নীলগিরি হইতে **আন্নামালাই, পালনি, কার্ডামম** পর্বত পর পর দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্য দিয়া কতকগুলি গিরিপথ আছে তাহার মধ্যে **থলঘাট** ও **ভোরঘাট** হইল প্রধান। এই গিরিপথ দিয়া কংকন উপকূলের সংগে যোগসূত্র রাখা সম্ভব।

দাক্ষিণাত্যের এই মালভূমির অতি প্রাচীন শিলাস্তর দ্বারা গঠিত। ধীরে ধীরে এই কঠিন শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকার সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমাংশের মাটিতে লাভা মিশ্রিত বলিয়া তাহা কৃষ্ণ বা কালো রং-এর। এই **কৃষ্ণমৃত্তিকা** অত্যন্ত উর্বর। এই মাটির জল ধারণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা বেশী। সেইজন্য এই অঞ্চলে কৃষিকাজের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতি পরিবেশের বৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে **তেলেংগানা** (অন্ধ্র প্রদেশ) ও **মহারাষ্ট্রের** মধ্যে পরিস্ফুট। আঞ্চলিকতার দিক দিয়া একটি হইতে অন্যটি কিঞ্চিৎ পৃথক হইলেও ব্যাপকভাবে ইহা একটি অঞ্চল বলিয়া পরিগণিত। পশ্চিমঘাটের পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয় আর পূর্বাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বৃষ্টি কম। ইহাকে **বৃষ্টিচ্ছায়**

(Rain shadow) অঞ্চল বলা হয় (২০" বৃষ্টিপাত)। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে পশ্চিমঘাটের উদ্ভিদজগৎ এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে জন-জীবন সীমাবদ্ধ ঠিক তাহার পশ্চিমাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর এবং স্বল্প বৃষ্টির অঞ্চলের জন-জীবন অনুরূপ। **পুণা, বেলগাম** অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়। ধীরে ধীরে **বিজাপুর, আহম্মদনগর** এমন কি **নাগপুর** প্রভৃতি অঞ্চলে উত্তরের প্রত্যাগত মৌসুমী বায়ুর জন্য শীতকালে কিছু কিছু বৃষ্টিপাত হয়। তাহাতে রবিশস্যের ফলন বাড়ে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে **কৃষ্ণা** ও **গোদাবরী** নদী বাহির হইয়াছে। এছাড়া **কয়না** নদীও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে বাহির হইয়াছে। কৃষ্ণা ও কয়না **করডের** নিকট মিলিত হইয়াছে। **তাপ্তি** নদী **জলগাঁও**-র নিকট দিয়া বহিয়া গিয়া আরব সাগরে পতিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রের এই অঞ্চলে সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহে বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাতের ফলে বনসম্পদ বিশেষভাবে বহু মূল্যবান গাছও পাওয়া যায়। নানা ধরনের উন্নত বাঁশ, সেগুন, কেন্দ গাছ জংগলের মূল্যবান বৃক্ষ। তাহা ছাড়া পাহাড়ের গায়ে তৃণগুল্ম প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। তাহা গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে দাক্ষিণাত্যের এই মালভূমি সঞ্চিত গলিত লাভায় স্তরে স্তরে জমিয়া উঠিয়াছিল যা পূর্বঘাট আর পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই স্তরে স্তরে সাজান লাভাভূমিকে **ডেকান ট্র্যাপ** (Deccan Trap) বলা হয়।

দাক্ষিণাত্যের এই অঞ্চলে তূলা, জোয়ার, বাজরা, গম, নানাপ্রকার তৈলবীজ প্রধান কৃষিজ পণ্য। তূলা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া সেখানে কাপড়ের কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। **কোলাপুরে** ভাল তাঁতের কাপড় তৈয়ার হয়। **পুণা** ও **বোম্বাই** শহরের নিত্য-নৈমিত্তিক চাহিদা মিটাইবার জন্য তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নানাপ্রকার ফল, শাকশব্জীরও উৎপাদন বাড়িয়াছে। এই অঞ্চলের গ্রামগুলি অত্যন্ত সুসংবদ্ধ। অনেক সময় এই সকল গ্রামের চারিদিকে দুর্গ-প্রাকার রহিয়াছে। এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ শহরগুলি হইল **আহম্মদনগর, ঔরংগাবাদ, কোলাপুর** প্রভৃতি। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের **নাসিক,** বিশেষ রেলওয়ে জংশন **মানমাদ,** এতদ্ভিন্ন, **আকোলা, অমরাবতী, ওয়ার্ধা** গুরুত্বপূর্ণ স্থান। নাসিকে গোদাবরীর নিকট স্নানঘাট প্রসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, **নাগপুর, শোলাপুর** ও পুণাই হইল এই অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যণিজ্যিক স্থান। দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পূর্বের

করে। সম্প্রতি সরকারী উদ্যোগে তাহাদের জন্য উপনিবেশ ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। এছাড়া অন্যান্য উপজাতির মধ্যে বান্‌জারাদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশী।

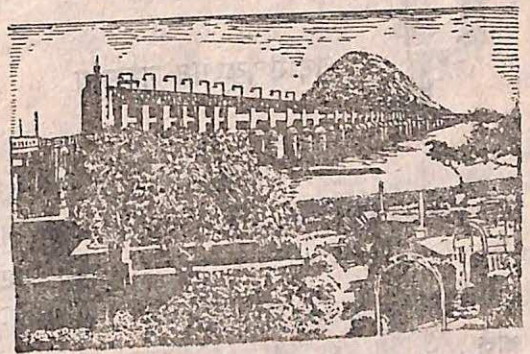
মহীশূর বা কর্ণাটক মালভূমি

দাক্ষিণাত্যের বিরাট মালভূমির অপর এক অংশ হইল মহীশূর বা কর্ণাটক অঞ্চলের মালভূমি। দক্ষিণের লাভাময় অঞ্চল হইতে ধীরে ধীরে এই অঞ্চল প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। উত্তর ও উত্তর-পূর্বে কৃষ্ণা ও তুংগভদ্রার পর্যংক (basin) পর্যন্ত ইহার সীমা। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক **কানাড়ি** ভাষায় কথা বলে। সম্প্রতি কর্ণাটক রাজ্য ভাষা-ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া ইহাতে কুরগ, দক্ষিণ কানাড়া ও বেলারি জেলা (মাদ্রাজ রাজ্যের) উত্তর কানাড়া, বেলগাম, বিজাপুর ও ধারওয়ার (বোম্বাই রাজ্যের), রাইচুর, গুলবার্গা ও বিদর (হায়দ্রাবাদ রাজ্যের) অঞ্চল রহিয়াছে।

এই রাজ্যের উচ্চ মালভূমি অঞ্চলকে **মলনাদ** বলা হয়। আর পশ্চিমের নিম্ন মালভূমিকে **ময়দান** বলা হয়। এই মালভূমি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঢালু। এই অঞ্চলে কাবেরী, কৃষ্ণা, পালার প্রভৃতি নদীগুলি পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে বাহির হইয়া পূর্বদিকে বহিয়া গিয়াছে। কাবেরী নদীর **শিবসমুদ্রম** প্রপাত ও শিরাবতী নদীর **গারসোপ্পা** প্রপাত হইতে কিছু জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এখানের জলবায়ু বেশ ভাল। পশ্চিমঘাটের ঢালে যখন অধিক বৃষ্টি হয় তখন পূর্ব অংশে কম বৃষ্টি। আবার শীতকালে পূর্ব অংশে বৃষ্টি হয়, পশ্চিমাংশে তখন বৃষ্টি হয় না। ফলে মলনাদ অঞ্চলের উপত্যকাতে আখ, কার্পাস এবং অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে যথেষ্ট ধান উৎপন্ন হয়। পূর্বদিকের ময়দান অঞ্চলে রাগি, বাজরা, জোয়ার ও নানা রকম তৈলবীজ বিশেষ করিয়া রেড়ির চাষ হয়।

মহীশূরের প্রাচীন **কোলার** অঞ্চলে স্বর্ণ পাওয়া যায়। **বাবাবুডান** অঞ্চলে **লৌহ**, বেলারি স্বন্দর অঞ্চলে ম্যাংগানীজ পাওয়া যায়। কয়লার অভাব বলিয়া ব্যাপক শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠে নাই তবুও জলবিদ্যুৎ সাহায্যে কিছু কিছু শিল্প সম্ভার গড়িয়া উঠিয়াছে। অরণ্যে আহৃত **চন্দন, সিংকোনা** পাওয়া যায় বলিয়া চন্দন কাঠের শিল্প ও তেল ও সাবানের কারখানা আছে। রেশম, চিনি, চামড়ার জিনিস, কাগজ ইত্যাদি তৈয়ারীর অনেক কারখানা আছে। **বাংগালোর,**

ধারওয়ার, বেলগাঁও, বেলারী, হুগলী এই অঞ্চলের প্রধান নগর। **গোকক** অঞ্চলে কাপড়ের কল আছে, তাছাড়া নানাবিধ হাতের কাজের কারখানা আছে। সম্প্রতি কর্ণাটক সরকার সমগ্র রাজ্যে সুন্দর রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়াছেন এবং সিল্কের কারখানা করিয়াছেন। বাংগালোর ও ভদ্রাবতী অঞ্চলে সিমেন্টের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। তুংগভদ্রা নদীতে বাঁধ দিয়া



ংগভদ্রা নদীর বাঁধ

ভদ্রা-প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ায় প্রায় আড়াই লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ ছাড়া কৃষ্ণার উপনদী **মালপ্রভাতে** একটি বড় বাঁধ তৈয়ার হইবে।

অনুশীলনী

১। ভারতের মালভূমিকে মোট কয়টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে তাহার বিবরণ দাও।

২। জামসেদপুরকে কেন্দ্র করিয়া কেন অনেকগুলি লৌহ বা ইস্পাতের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

৩। দাক্ষিণাত্য বা লাভা অঞ্চলের মালভূমির বৈশিষ্ট্য কী?

৪। পূর্বঘাট পর্বতমালা ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা কোথায় মিলিত হইয়াছে?

৫। 'ডেক্যান ট্রাপ' কাহাকে বলে?

৬। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের প্রধান শস্য কী?

৭। তেলেংগানা অঞ্চলের উন্নতির জন্য কী কী প্রকল্প সরকার গ্রহণ করিয়াছেন?

৮। মহীশূর বা কর্ণাটক মালভূমি সম্পর্কে বিবরণ দাও।

৯। দাক্ষিণাত্যের কোথায় হীরক এবং স্বর্ণ পাওয়া যায়?

১০। তেলেংগানা অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহের কারণ কী?

(ক) বিশাখাপত্তনম ও শ্রীকাকুলামের তটভূমি, (খ) গোদাবরী ও কৃষ্ণা ব-দ্বীপ অঞ্চল, (গ) নেলোর ব-দ্বীপ অঞ্চলে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

ওড়িশার ব-দ্বীপ অঞ্চল প্রধানত বৈতরণী, ব্রাহ্মণী ও মহানদীর পলি দ্বারা গঠিত এবং বালেশ্বর হইতে চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত প্রায় ১২৫ মাইল (১৬৯ কিমি.) দীর্ঘ। আর বিস্তৃতিও প্রায় ৫০ মাইল। যদিও মহানদীতে প্রচণ্ড বন্যা হয় তবুও **হিরাকুঁদ** পরিকল্পনা মহানদীর বন্যাকে অবরোধ করিতে সমর্থ বলিয়া অনেকের অভিমত। যদিও এই অঞ্চলের পশ্চিমাংশে পার্বত্য অঞ্চল বলিলে **নীলগিরি** পাহাড়কে বুঝায়। আর দক্ষিণাঞ্চলের চিল্কা হ্রদের আয়তন প্রায় ৪৫০ বর্গমাইল। চিল্কার দক্ষিণের **গঞ্জাম** অঞ্চলকে ব-দ্বীপ বলা চলে না যদিও কাঁকুরে মাটির স্থানে স্থানে উর্বরাঞ্চলের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। মহানদীর খালগুলিতে কেবল যে গমনাগমনের সুবিধা রহিয়াছে তাহা নহে বরং জলসেচের কাজ চলে। পুরী অঞ্চলে **ধান** ও **রাগি** উৎপন্ন শস্য আর গঞ্জাম অঞ্চলে **আখ** ও নানাপ্রকার **তৈলবীজ** উৎপন্ন হয়। ওড়িশা রাজ্যের **পুরী, ভুবনেশ্বর** ও **কটক** প্রধান শহর। পুরী, ভুবনেশ্বর ও **কোনারকের** মন্দিরের ভাস্কর্য বিশ্ববিখ্যাত। প্রতিবৎসর- জগন্নাথের রথযাত্রার মেলায় ভারতের নানা স্থান হইতে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় এবং পবিত্র হিন্দু তীর্থস্থান বলিয়া নানা সংস্কৃতির লেনদেন হয়। সম্প্রতি ভুবনেশ্বর ও কটকের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নানাভাবে শিল্প প্রসার ঘটিতেছে। কাঁচ ও কাগজের কারখানা, চিনির কল ও লৌহ-সরঞ্জামের নানা কারখানা হইল ওড়িশার শিল্প প্রসারের একদিক। সম্বলপুর ও রাউরকেলা শিল্পপ্রধান নগর হওয়ায় ওড়িশার জনজীবনে এর প্রভাবও প্রতিফলিত।

অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল ভূমির শ্রীকাকুলাম ও বিশাখাপত্তনম্ জেলা দুইটি উল্লেখযোগ্য। বিশাখাপত্তনম্ বন্দর ও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র ভারতের অন্যতম বন্দর। এই অঞ্চলের প্রধান শস্য **ধান, রাগি, চীনাবাদাম, জোয়ার** ও নানারকম **ডাল কলাই**। এই অঞ্চলের খনিজ সম্ভার বলিতে কিঞ্চিৎ **গ্রাফাইট**, ম্যাংগানীজ কেয়োলিন, অভ্র বুঝায়। সম্প্রতি বিশাখাপত্তনমে জাহাজ-নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় জামসেদপুর ও রাউরকেলার সংগে এক নিয়মিত সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং খনিজ পদার্থেরও ব্যবহার সম্ভব হইয়াছে। এই অঞ্চল অত্যন্ত দরিদ্র। সম্প্রতি শ্রীকাকুলামের উপজাতি

অধ্যুষিত অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ নানাভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

পূর্ব উপকূলের তটভূমি পূর্বঘাট পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইলেও স্থানে স্থানে বিরাট বালুর ঢিবি রহিয়াছে আর এসবের গা ঘেঁষিয়া **গরাণ, ঝাউ,** জাতীয় গাছের অরণ্য দেখা যায়। এসকল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে **জ্বালানি কাঠ** সংগৃহীত হয়। অভ্যন্তরে কংকরাকীর্ণ অঞ্চল ও তটভূমির বালুকাপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চল হইল প্রকৃত ব-দ্বীপ অঞ্চল যাহা অত্যন্ত উর্বর ও ঘনবসতিপূর্ণ। কৃষ্ণানদী **বিজয়াড়ার** নিকটে যথেষ্ট বিস্তৃত। এই অঞ্চল হইতে খাল কাটিয়া জলসেচের ব্যবস্থা আছে। গোদাবরী ব-দ্বীপের **দোওলেশ্বরম্** প্রধান নগর। এই অঞ্চলে ঘূর্ণীঝড় ও বন্যার উৎপাত থাকিলেও প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয়। গোদাবরীর বন্যায় বেশীর ভাগ জমি জলপ্লাবিত হয়। তবুও গোদাবরীর এই অঞ্চল প্রধান শস্যক্ষেত্র এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের গড় ৩৫"। অক্টোবর মাসের দিকে অনেক সময় বৃষ্টিপাত যথেষ্ট হয় বলিয়া যেমন ধানের দিকে ভাল তেমন চীনাবাদাম ও তূলার পক্ষে অসুবিধা সৃষ্টি করে। পশ্চিম গোদাবরী ও কৃষ্ণার ব-দ্বীপ অঞ্চলে কোন কোন স্থানে বৎসরে দুইবার **ধান** পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া **জোয়ার, তিল** ও **বাদাম** প্রধান শস্য।

এই অঞ্চলের খনিজ সম্ভার অত্যন্ত সীমিত। ওড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ, কেওনঝর, সুন্দরগড় অঞ্চলের খনিরাজি হইতে মূলত জামসেদপুর শিল্প-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশাখাপত্তনমের ম্যাংগানীজ নেলোরের অভ্রখনিই হইল স্থানীয় শিল্প সম্ভারের মূল উপকরণ। কুডাপ্পা জেলার অ্যাসবেসটস ও কর্ণুল জেলার লৌহ, এইসবের জন্য কয়েকটি শিল্পসংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশাখাপত্তনমে জাহাজ নির্মাণকেন্দ্র ভারত সরকারের অন্যতম শিল্প প্রচেষ্টার উদাহরণ। আবার ঐ বিশাখাপত্তনম হইল একমাত্র উল্লেখযোগ্য পোতাশ্রয়। **ডলফিন নোজ** এবং মূল ভূখণ্ডের মধ্যে রহিয়াছে সমুদ্র। এই সমুদ্রের গভীরতা বেশী বলিয়া জাহাজ রাখিবার সুবিধা। আবার জাহাজ তৈয়ারী বা মেরামতির জন্য যে সকল নরম কাঠের প্রয়োজন হয় তাহাও স্থানীয় উপকূল হইতে আসে। জাহাজ নির্মাণের জন্য যে লোহা দরকার তাহা রেলপথে টাটা হইতে আনিবার সুবিধা আছে। উচ্চ পর্বতশ্রেণী থাকার জন্য সমুদ্রের ঝড়ের প্রাবল্য তেমন অনুভূত হয় না। সেইজন্য বিশাখাপত্তনম ভাল পোতাশ্রয় ও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। কোন কোন স্থানে **গ্রাফাইট,**

কেওলিন পাওয়া যায়। স্থানীয় **বাঁশ, খড়** প্রভৃতি দ্বারা রাজমুণ্ড্রির **কাগজের কারখানা** চলে। কাকিনাড় অঞ্চলে **রাসায়নিক শিল্প** প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। গোদাবরীর ব-দ্বীপ অঞ্চল শস্যক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত এবং এখানের জনজীবনে কৃষিভিত্তিক সমৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। গোদাবরীতে **রামপদ সাগর বহুমুখী পরিকল্পনা** সার্থক হইলে জলবিদ্যুৎ পাওয়া সহজ হইবে এবং দ্রুত শিল্প প্রসার ঘটিবে। এই অঞ্চলের প্রধান দুই নগর হইল **বিজয়াড়া** এবং **রাজমুণ্ড্রি**। **গুন্টুর** এবং **নেলোর** অন্যতম বাণিজ্যিক অঞ্চল। **মুসলিপত্তনম, কোকনদ** বন্দরের খ্যাতি আছে। মুসলিপত্তনমের কার্পেট ও ছাপা শাড়ির খ্যাতি আছে।

নেলোর

প্রকৃতপক্ষে নেলোর অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হইল অতি প্রাচীন শিলাস্তরের মধ্যে মধ্যে বালুকারাশির সমাবেশ। উপকূলের বৈশিষ্ট্য হইল অগভীর লবণাক্ত **পুলিক্যাট উপহ্রদ** (Lagoon)। উপকূলের পলিময় ভূমির অভ্যন্তরের বিস্তৃতি ১৪ মাইলের (২২·৫ কিমি.) বেশী নয়। এইজন্য এই অঞ্চলের কৃষিও অত্যন্ত সীমিত। প্রধান শস্য **জোয়ার** যদিও **ধান** চাষের গুরুত্ব আছে। বিশেষভাবে **পেন্নর** অঞ্চলে জলসেচের মাধ্যমে চাষের কাজ চলে। উপহ্রদের দ্বীপাঞ্চলে ঝিনুক বা গুগলির খোলস পুড়াইয়া চুন তৈয়ারী করা হয় যাহা বাড়ী তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রধান শহর হইল নেলোর। এই অঞ্চলে কিছু কিছু মাটির জিনিসপত্র তৈয়ারী হয়। এই অঞ্চলে তেলেগু ভাষা ও সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়, তাহার পর হইল তামিলনাড়ু। কৃষ্ণা ব-দ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিণের তটভূমি কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহা **করমণ্ডল** নামে পরিচিত। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ) অঞ্চলই ইহার অন্তর্গত। যদিও তামিলনাড়ুর অভ্যন্তরে পাহাড় বা শৈলশ্রেণী বিদ্যমান তথাপি তাহা মহীশূর মালভূমি হইতে ভিন্ন। সুতরাং এই অঞ্চলকে এক বিশেষ অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত করা হয়। অনেকে তামিলনাড়ুর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ছয়টি বিশেষ **মণ্ডলে** ভাগ করিয়া থাকেন। তাহা হইল (১) উপকূলীয় করমণ্ডল সমভূমি (২) তামিলনাড়ু পাহাড় শ্রেণী (৩) পন্নার বা পালার ভূমি, (৪) কংগুনাড়, (৫) কাবেরীর ব-দ্বীপ অঞ্চল, এবং (৬) শুষ্ক দক্ষিণ-পূর্বাংশ যাহা ভাইগই পর্বত হইতে আরম্ভ করিয়া **মাদুরাই** তিরুনেভেলি

পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ভূখণ্ডের প্রাচীন শিলারাজির বিভিন্ন স্তরে নব্য প্রস্তর যুগের প্রস্তর নির্মিত মসৃণ আয়ুধের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

করমণ্ডল উপকূলের প্রধান অঞ্চল হইল **চিংলিপুট** ও আরকট ও **ত্রিচিনাপলি**। এই অঞ্চলে মিয়োসিন যুগের শিলাস্তরের সংগে সামুদ্রিক পলি এবং বালুকাস্তরের অস্তিত্ব দেখা যায় যাহার সহিত কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের এত সামঞ্জস্য রহিয়াছে। বিচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণ মৃত্তিকার স্তরের সংগে বালুকামিশ্রিত কর্দমের উপকরণ রহিয়াছে। এই অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৪০-৪৫ ইঞ্চি যাহা প্রায় তিন-চার মাসে সীমাবদ্ধ। ভূ-গঠনের বৈচিত্র্য এবং জলবায়ুর প্রভাব এই অঞ্চলের কৃষি ও জনজীবনে নানাভাবে প্রতিফলিত। মার্চ হইতে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল তখন কোন প্রকার ব্যাপক কৃষিকার্য সম্ভব নয়। ঐ সময় সাধারণ মানুষ জ্বালানি সংগ্রহ, অল্প বাগান বাগিচার কাজ যাহা পুকুর অথবা কুয়ার জলে সম্ভব তাহাই করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া ঘরবাড়ী তৈয়ার, মেরামতের ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। ইহা ছাড়া পূজা-পার্বন ও মেলা এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান বিবাহ ইত্যাদি এই সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জুনের শেষে বৃষ্টিপাতের সংগে সংগে গ্রামের লোক চঞ্চল হইয়া উঠে। চাষের যন্ত্রপাতির মেরামতি, বলদ কেনা, জমির আল দেওয়া, সার ছড়ানো প্রভৃতি বৃষ্টির প্রায় সূচনাতেই আরম্ভ হয়। **ধান, রাগি, তিল, ডাল-কলাই,** চীনাবাদাম এই সময় বুনা হয়। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে যখন পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয় তখন ধানচারা রোপন বা আগাছা তোলার কাজ চলে। জানুয়ারির মাঝামাঝি শস্য ঘরে তোলার পালা—আবার সাময়িক প্রাচুর্যের আনন্দে জনজীবনে ও সামাজিক জীবনে নানা অনুষ্ঠানের ঘটা পড়িয়া যায়। এই সময় পলিমাটি পূর্ণ অঞ্চলে যেখানে জলসেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে আবার চাষের কাজ চলে যদিও শীতকালের বৃষ্টিপাত ৪/৫ ইঞ্চির বেশী নয়।

উপকূলীয় জীবনযাত্রা

সমুদ্র ও স্থলভাগের মধ্যবর্তী অঞ্চল হইল উপকূল। ইহাকে সমুদ্রের তটভূমি বলা হয়। পূরা কোটালের সময় এই অংশ সমুদ্রের জোয়ারে ডুবিয়া যায়। আবার মরা কোটালের জোয়ারে তটরেখা অনেক নীচে চলিয়া আসে। সাধারণত এই অংশ বালি, নুড়ি প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকে এবং ইহা **সৈকত**

বলিয়া অভিহিত। সমুদ্রতরঙ্গ, জোয়ার ভাঁটা ইত্যাদি কারণের জন্য উপকূলগুলির বাহ্যিক গড়নের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। তরঙ্গ যখন আছড়াইয়া উপকূলের শিলাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয় তখন বালুকণা ও নুড়ির সৃষ্টি হয়। প্রবল তরঙ্গে সে সব উপকূলের বিভিন্ন অঞ্চলে জমা হয়। আবার স্থলভাগ হইতে অনেক ক্ষয়ে আসা জিনিসও সৈকতে জমা হয়। কখনও সব উচ্চ ঢিবির মত জমিয়া যায় তাহাকে **সৈকত শিরা** বলা হয়। কখনও বা অবিন্যস্ত বালুর পাহাড়ের মত হয়, তাহাকে বালুয়াড়ি বলা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব উপকূলের তটভূমি অভগ্ন বলিয়া ভাল পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠে নাই কেবলমাত্র **বিশাখাপত্তনম** ছাড়া। পূর্বকূলীয় তটভূমিতে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর ব-দ্বীপ রহিয়াছে। ঐ ব-দ্বীপ অঞ্চল পলিজ মাটিতে পূর্ণ। কৃষির উপযোগী বলিয়া ঘন বসতিপূর্ণ।

দেশের অভ্যন্তরের জীবনযাত্রার সংগে উপকূলীয় অঞ্চলের জীবনযাত্রার বেশ তারতম্য রহিয়াছে। প্রথমত পরিবেশ পরিমণ্ডল, ভূমির প্রকৃতি ও বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলের উদ্ভিদ জগতকে নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া জনজীবনের বিভিন্ন কর্মধারা সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। স্বাভাবিক বনরাজি ছাড়া উপকূলীয় বালিমাটি অঞ্চলে নারিকেল ও তালের কুঞ্জ রহিয়াছে। নারিকেল হইতে যেমন তেল ও খাবার পাওয়া যায় তেমনি নারিকেলের ছোবড়া হইতে দড়ি, পাপোষ ও আরও নানাপ্রকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপকরণ পাওয়া যায়। আবার তাল গাছের পাতা দিয়া স্থানীয় মানুষ ঘরদোর ছাওয়ার কাজ করে। গ্রীষ্মের দিনে তালের কোয়া খাওয়া হয়। আর তাল হইতে তৈয়ারী হয় **তাড়ি** বা **মদ**। আর ঘর তৈয়ারীর কাঠ বাদে জ্বালানি হিসাবে এই অঞ্চলের গাছ ব্যবহৃত হয়। এই গাছের শিকড় মাটিতে নাইট্রোজেন ধরিয়া রাখে ফলে অন্য প্রকার শস্য উৎপাদনের সুবিধা হয়। বিশেষভাবে অনেকক্ষেত্রে ঘাসজাতীয় তৃণ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ইহা পশুপালনের পক্ষে অনুকূল।

একদিকে যেমন লবণ সংগ্রহের বা উৎপাদনের সুবিধা অন্যদিকে সমুদ্রে **মৎস্য শিকার** আর একটি প্রধান উপজীবিকা। সেইজন্য এই অঞ্চলে তটভূমির সন্নিকটে ধীবরপল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের তাড়াতাড়িতে অন্যত্র মাছ চালান দিবার সুবিধা নাই বলিয়া নুন মিশাইয়া মাছ শুকাইয়া রাখে এবং নানা জায়গায় এই **শুটকী** মাছ চালান যায়। মাছ ধরিবার জন্য তাহারা তিন

চারটি কাঠের গুঁড়িকে এমনভাবে বাঁধিয়া লয় যে তাহা নৌকার মত হয় এবং তাহাতে ঢেউ ভাঙিয়া যায় অথচ তাহা জলে ডুবিয়া যায় না। এই নৌকাকে **ক্যাটামারান** (Catamaran) বলা হয়। ইহা ছাড়া সামুদ্রিক ঝিনুক বা শামুকের খোলস পুড়াইয়া যে চুন তৈয়ারী হয় তাহা ঘর তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত



মৎস্য শিকার

হয় আর ঐ চুন পোড়ান হয় উপহ্রদের মধ্যবর্তী অব্যবহৃত ক্ষুদ্র দ্বীপের মত জায়গাগুলিতে। এই সকল জিনিস নানাভাবে শহরে আসে—বিশেষভাবে খাল কাটিয়া নৌকাপথে বহন করার সুবিধা অনেক।

উপকূলীয় শহরের মধ্যে **মাদ্রাজ** হইল প্রধান। কেবল নগর হিসাবে নহে মাদ্রাজে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। তামিলনাড়ুর মাদুরাই ও কয়ম্বুটুর সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের খ্যাতি আছে। ইহা ছাড়া এলুমিনিয়মের জিনিসপত্র তৈয়ারীর কারখানা আছে। 'কর্নাটিক' ও 'বাকিংহাম' কোম্পানির কাপড়ের সুখ্যাতি দীর্ঘ দিনের। এই দুইটি কলে ১১০০ লোক কাজ করিয়া থাকে। কর্মীদের বংশধরেরাই ঐখানে কাজ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া এই অঞ্চলের তাঁতের কাপড়ের সুখ্যাতি আছে। বিড়ি বা চুরুট প্রচুর উৎপন্ন হয়।

কাবেরী উপত্যকা

ভারতের দক্ষিণে কাবেরী নদীর অববাহিকার গুরুত্ব অনেক। কেননা সম্প্রতি পরিকল্পনার মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে জল-বিদ্যুৎ পাওয়া যায় বলিয়া স্থানীয় শহরগুলিকে এক দিকে যেমন বৈদ্যুতিককরণ করা সম্ভব হইয়াছে তেমনি অপর দিকে শিল্প প্রসারও ঘটিয়াছে। মহীশূরের ১২ মাইলের মধ্যে **কৃষ্ণরাজসাগর** জলাধারের সন্নিকটে ইহাকে পার্বত্য নদী বলিয়া মনে হইলেও ইহার অববাহিকা অঞ্চল কৃষিপ্রধান। উপনদী **সিমসার** নিকটে **শিবসমুদ্রম্**-এ দীর্ঘদিন হইতে জল-বিদ্যুতের উৎপাদন কেন্দ্র আছে। এইখানে একটি

জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। **সালেমের** নিকটবর্তী অঞ্চলে **মেত্তুর** বাঁধ আছে। তাহা পৃথিবীর অন্যতম এক বৃহৎ জলাশয় বা হ্রদ (৬০ বর্গ মাইল) **তিরুচেরিপলির** কয়েক মাইল আগে **শ্রীরঙ্গম** কাবেরী দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। তথা হইতে **তানজোর** জেলায় পতিত হইয়া উক্ত অঞ্চলকে শস্য সমৃদ্ধ করিয়াছে। মোট কথা এই অঞ্চলের জলবিদ্যুতের ফলে কম্বোটুরে কাপড়ের ও সিমেন্টের কারখানা, **তিরুচেরিপলিতে** কাপড় ও সিমেন্ট ও রেলের সরঞ্জাম তৈয়ারী হয়, **সালেমে** কাপড়ের কল আছে। কাবেরী ধীরে ধীরে কম্বুটুরে ও পালঘাটের মধ্যে এক নিম্ন উপত্যকা অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইয়া **থানজায়ুর** জেলায় বৃহৎ ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরে পতিত হইবার মুখে অসংখ্য নদী ও নালা সৃষ্টি হওয়ায় ঐ অঞ্চলটি অত্যন্ত উর্বর। এই ব-দ্বীপ অঞ্চলে **কুম্ভকনমে** বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৪৭ ইঞ্চি। অক্টোবর হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুপ্রবাহে বৃষ্টিপাত হয়। আবার মে মাসে যথেষ্ট ঝড় ও বৃষ্টিপাত হয়। সারা বৎসর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া এখানের উদ্ভিদ জগতের চিরসবুজ নয়নাভিরাম। এই অঞ্চলে উর্বর শস্যক্ষেত্র থাকায় ঘন বসতি আর তাহাদের কেন্দ্র করিয়া নগর, হাটবাজার, গঞ্জ ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলগুলিতে বৃটিশ উপনিবেশের প্রভাব আছে। **নগপত্তিনাম** বন্দর হইতে মূলত **শ্রীলংকা** ও **ব্রহ্মদেশে** বাণিজ্যপোত যাতায়াত করে। এই অঞ্চল হইতে তাল, গুড়, নানা রকম সজী ও ফল, চুরুট, সুপারি রপ্তানি হয়। এই অঞ্চল দিয়া **কুড়ালোর** শহর হইতে ভারতের বাহিরে যথেষ্ট চীনাবাদাম, ছাপা শাড়ী ও কাঠ রপ্তানি হয়। এই উপকূল অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোক ব্যবসা-বাণিজ্যে ও জাহাজে মাঝি বা খালাসীর কাজ করিয়া থাকে। **মাদুরাই** ও **রামনাথপুরমে** পুকুর কাটিয়া চাষের কাজ চলে এবং গ্রামগুলি ঐ জলাশয়কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। **তিরুনাভেলি** হইতে কুমারিকা অন্তরীপ অঞ্চলে বছরে দুইবার বৃষ্টিপাত ঘটে বলিয়া তাহার উদ্ভিদ জগৎ ও লোকবসতি বা লোকজীবন ভিন্ন। কেননা বৎসরে দশমাস সময়ই কৃষিকার্যে চলিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন জলসেচ এলাকাগুলিতে বৎসরে দুইবার প্রধান ফসল পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কলা, পান, হলুদ, আখ, লঙ্কা যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রাগি ও নানাপ্রকার তৈলবীজও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া কিছু কিছু তেলের কল আছে। ইহাছাড়া এখানের এক শ্রেণীর লোকের মাদুর, তালপাতার

কাজে দক্ষতা আছে। **কোড়ায়ার** উপত্যকায় **নাগরকয়েল** প্রধান শহর।

ভারতের অন্য এক অংশ বঙ্গোপসাগরের নিমজ্জমান পাহাড়ের চূড়ায় দ্বীপের আকারে অবস্থিত। যাহা **আন্দামান ও নিকোবর** দ্বীপমালা বলিয়া পরিচিত। ঐ অঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৮,২৯৩ বর্গ কিলোমিটার। এই দ্বীপ নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত এবং ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেশী। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের জন্য বৎসরের প্রায় আটমাস সময় বৃষ্টি হয় ফলে স্বাভাবিক অরণ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আগে আন্দামানে অপরাধীদের নির্বাসিত করা হইত। ইহার জনসংখ্যা ১,১৫,১৩৩। এই জনসংখ্যাকে উপজাতি, সাধারণ বাসিন্দা, উদ্বাস্তু ও শ্রমিক-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীতে ভাগ করা চলে। জারাওরা, ওঙ্গে, নিকোবরী প্রভৃতি আদিম বাসিন্দা। এই সকল উপজাতির জীবনে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত কম। আন্দামানের কাঠ, কলা, ও নারকেল উল্লেখযোগ্য। উপজাতিগুলি অরণ্যে ও নদীতে শিকার করে ও জংগল হইতে ফলমূল ও মধু সংগ্রহ করিয়া দিন কাটায়।

অনুশীলনী

১। পূর্ব উপকূলীয় সমভূমির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
২। পূর্ব উপকূলীয় সমভূমিকে কোন্ কোন্ নদী ব-দ্বীপ রচনা করিয়াছে তাহার বিবরণ দাও।
৩। ঐ উপকূলের বৃষ্টিপাত সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
৪। উপকূলের প্রধান শস্য কী?
৫। উপকূলীয় জীবনযাত্রা বর্ণনা কর।
৬। উপকূলীয় শহর ও প্রধান শিল্পাঞ্চল সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
৭। বিশাখাপত্তনম বন্দর একটি ভাল পোতাশ্রয় কেন? এখানে জাহাজ নির্মাণের সুবিধা কী?
৮। আন্দামান ও নিকোবর সম্পর্কে সংক্ষেপে বিবরণ দাও।

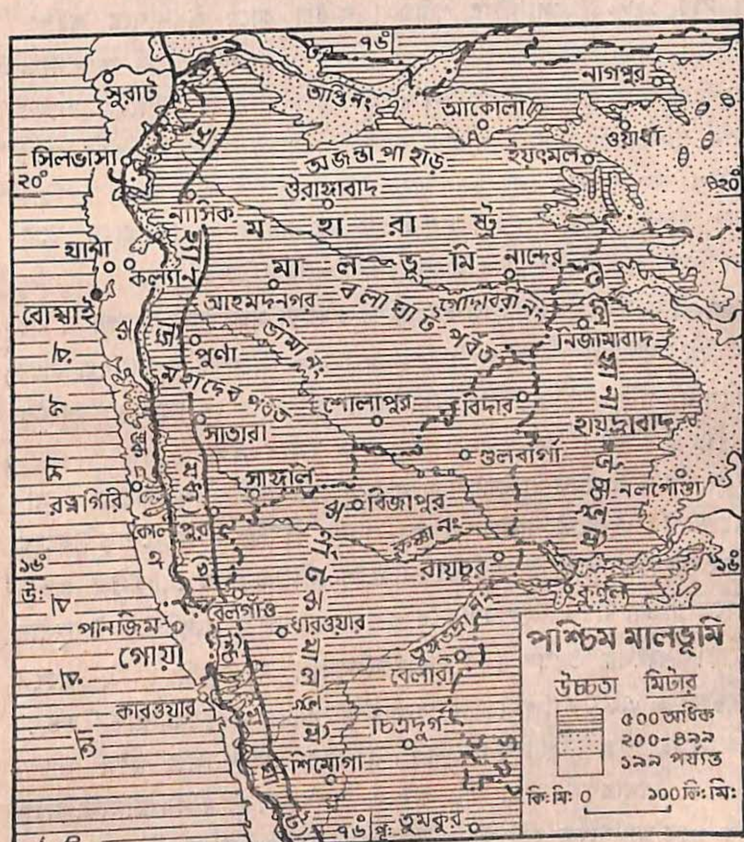
৮ পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি

ভারতের পশ্চিম উপকূল পূর্ব উপকূল হইতে অধিক ভগ্ন হওয়ায় কতকগুলি স্বাভাবিক বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। সমগ্র পশ্চিম উপকূল কচ্ছ হইতে কেরল পর্যন্ত বিস্তৃত কিন্তু এই সমগ্র অঞ্চলের ভূগঠন ও লোকজীবন একই রকম নয় বলিয়া ইহাকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। **কচ্ছ ও কাথিয়াওয়াড়** একটি বিশেষ অঞ্চল। **গুজরাট** আর এক অঞ্চল, **কংকন, গোয়া ও কানাড়া** এবং **কেরল।** গোয়া ও কানাড়া অঞ্চলটি কংকন ও কেরল বা মালাবার উপকূল-এর মধ্যবর্তী অঞ্চল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা লম্বালম্বিভাবে দক্ষিণদিকে আসিয়াছে যাহার পূর্বদিকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল। আর অবিস্তৃত তটভূমি হইল সমভূমি যাহার প্রস্থ ৩-৪ মাইল হইতে ৩০-৪০ মাইল পর্যন্ত।

গোয়ার দক্ষিণাংশ **কংকন** উপকূল নামে পরিচিত। ইহা প্রায় ৩৩০ মাইল দীর্ঘ। এই নিম্নভূমি মধ্যে মধ্যে বিক্ষিপ্ত শৈলশ্রেণীতে বাধা পাইয়াছে। **বৈতরণী, উলাহা, আম্বা** প্রভৃতি নদীগুলি এই অঞ্চলে প্রবাহিত। ইহা ছাড়া বেশিষ্টি, সাবিত্রী প্রভৃতি নদীগুলিও উল্লেখযোগ্য। কংকন উপকূলে বৃষ্টিপাতের হার বৎসরে ৭৫"-১০০" পর্যন্ত। **ধানই** প্রধান শস্য। ইহাছাড়া **রাগি, ডাল-কলাই** যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। **নারিকেল** স্বাভাবিকভাবে উপকূল অঞ্চলে জন্মায়। কোন কোন অঞ্চলে **পাট ও মেসতা** জন্মায়। তবে উপকূলে ঝাউগাছ প্রধান জ্বালানির কাজ করে। এই অঞ্চলের প্রধান নগর হইল **বোম্বাই**। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া **থানা ও কল্যাণ** দুইটি শিল্পনগর গড়িয়া উঠিয়াছে। **নাসিক,** পুনা প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত রেলপথে যোগাযোগ

থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের আশেপাশের শিল্পাঞ্চল লইয়া বৃহত্তর বোম্বাই।

বোম্বাই পশ্চিম উপকূলের একটি দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত ইহার আশে পাশে রহিয়াছে প্রবাল প্রাচীর আর চুনা পাথরের পাহাড়। বোম্বাইতে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় রহিয়াছে। থলঘাট ও ভোরঘাট নামে দুইটি গিরিপথের মাধ্যমে এই বোম্বাই বন্দর ভারতের অন্যান্য স্থানের সংগে সংযুক্ত। পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণী স্বাভাবিক ভাবে প্রাচীরের মত থাকায় অন্যান্য অংশের সহিত সংযোগ রক্ষা



করা কঠিন। পালঘাট গিরিপথ দিয়া ম্যাংগালোর, কোচিন, ত্রিবান্দ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের সংগে রেলপথে সংযোগ রক্ষা করা যায়।

পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমিতে নানা রকমের মাটি দেখিতে পাওয়া যায়।

একেবারে তটভূমির মাটি বালিরাশিতে পূর্ণ এবং তাহা সম্পূর্ণ অনুর্বর। কংকন অঞ্চলের মাটি পলিজ বলিয়া তাহা অপেক্ষাকৃত উর্বর। অবশ্য উত্তর কংকনের কোন কোন অংশে কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা যায়। আবার কর্ণাটক অঞ্চলের নেত্রবতী উপত্যকায় কিছু কিছু পলিজ মাটি দেখা যায়।

এই অঞ্চলের প্রধান দুইটি নদী হইল **নর্মদা** ও তাপ্তী। এই দুইটি নদীর মোহনায় কোন ব-দ্বীপ নাই। নর্মদা বিন্ধ্যপর্বতের পূর্বাংশ **মহাকাল** পর্বতের শৃংগ হইতে উৎপন্ন হইয়া সাতপুরা পর্বতের উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রায় দীর্ঘ ১২৮০ কিলোমিটার পরিক্রমা করিয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। নর্মদা মার্বেল পাহাড় হইতে পতিত হইবার সময় জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে। নর্মদা নদীর বিভিন্ন স্থানে প্রত্নপ্রস্তর যুগের পাথরের অস্ত্রের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আবার অনেক সময় ঐ সকল অস্ত্রের সংগে শিবালিক অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রস্তরের অস্ত্রের মিল দেখা যায়। তাহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন সুপ্রাচীন যুগে ঐ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী হাড় প্রবল শীতে অথবা হিম প্রবাহের ফলে নর্মদা অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছিল।

তাপ্তী নদী মহাদেব পাহাড় হইতে উদ্ভূত হইয়া সাতপুরা পর্বতের দক্ষিণ দিক দিয়া পশ্চিমে চলিয়া আসিয়াছে এবং ৯৬০ কিলোমিটার আসিয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। নর্মদা ও তাপ্তী প্রায় সমান্তরাল। তাপ্তীর উপনদীর নাম পূর্ণা। ইহার মোহানায় কোন ব-দ্বীপ নাই।

গোয়ার উত্তরাঞ্চলে দাক্ষিণাত্যের লাভাভূমি ও প্রাচীন **আর্কিয়ান** শিলা-স্তরের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। গোয়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত পোর্তুগীজদের অধীনে থাকার ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রায় পোর্তুগীজ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে রহিয়াছে মারাঠী সংস্কৃতি। উপকূলীয় কানাড়া অঞ্চলের উত্তরভাগ অপেক্ষা দক্ষিণভাগ যথেষ্ট নিম্ন। ঐ অঞ্চলে **কারোয়াড়** এবং **কালিনড়ি** হইল প্রধান বন্দর। উপকূলে স্বাভাবিকভাবে নারিকেলের কুঞ্জ রহিয়াছে। আর অভ্যন্তরে প্রধান শস্য হইল **ধান।** ইহাছাড়া নানারকম মসলা এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ কানাড়া অঞ্চল উত্তর কানাড়া অঞ্চল হইতে কিছুটা চওড়া বেশী। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার স্বাভাবিক অরণ্যাঞ্চলে ব্যাপক কৃষিকাজ সম্ভব নয়। স্থানীয় উপজাতীয় অধিবাসীরা পাহাড়ের গা কাটিয়া যেমন চাষ করে আবার পাহাড়ের কিছু অংশে ব্যাপক চাষ করিয়া আবার অন্য অংশে চাষ করে। তাহাকে **বদলী প্রথার**

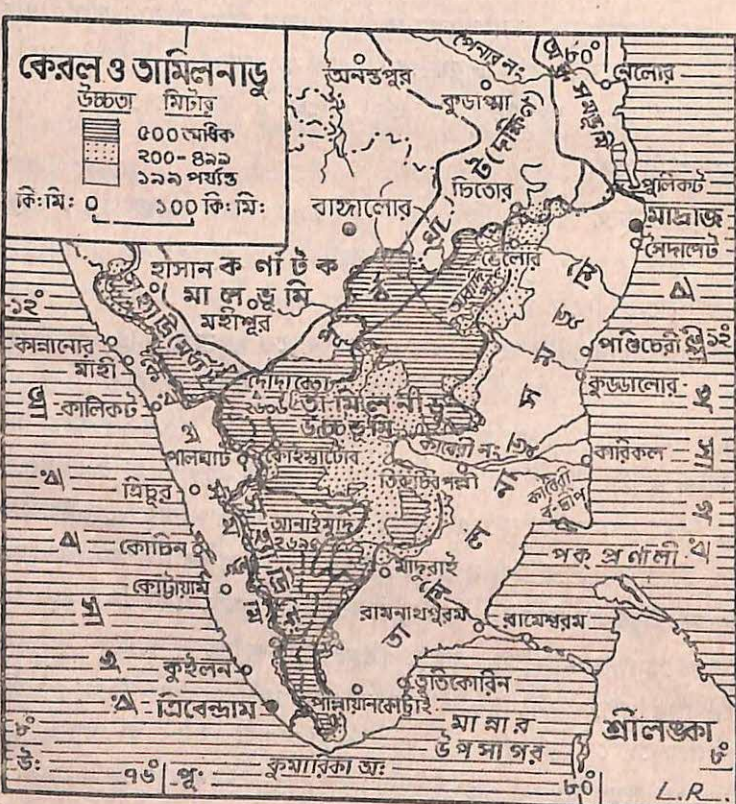
পাহাড়ী চাষ (Shifting hill cultivation) বলা হয়। স্থানীয় ভাষায় ইহা **ঝুমরি** বলিয়া পরিচিত। আসামে এই চাষের নাম **ঝুমচাষ**। একটি অঞ্চল ঠিক করিয়া তাহা কাটা হয় ও চাষের কাজ চলে। পরে তাহা বাদ দেওয়া হয়। এই অঞ্চলের জংগলে সেগুন ছাড়া চন্দন, বাঁশ, বেত, বাবলা, শিমূল, সেগুন কাঠ পাওয়া যায়। আর যথেষ্ট মধু এবং মোম উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের কাজুবাদাম ভারতের সর্বত্র রপ্তানি হয়। কাজুবাদামের ফলের অংশ হইতে ভাল সুরা তৈয়ারী হয়। কেবলমাত্র সীমিত পলিমাটির অঞ্চলে **ধান ও ডালকলাই** উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রধান খাদ্যশস্য। এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক শহর হইল **ম্যাংগালোর।** ম্যাংগালোরের টাইল সমগ্র দক্ষিণ ভারতে চালান যায় —ইহাই এ অঞ্চলের প্রধান শিল্পসম্ভার। প্রায় কমপক্ষে ৪০টি টাইল তৈয়ারীর কারখানা আছে। কলম্বো, পূর্ব আফ্রিকা, পারশ্য ও মালয় দেশে এই সকল টাইল রপ্তানি হয়।

সমুদ্র উপকূলে জলবায়ু ভিন্ন প্রকৃতির হয়। কেননা সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠ যতটা গরম হয় জলভাগ ঠিক ততটা গরম হয়। ভূপৃষ্ঠের বায়ু গরম হইয়া গেলে উপরের দিকে হাল্কা হইয়া উড়িয়া যায়। তখন জলভাগের ঠাণ্ডা বাতাস স্থলভাগের দিকে বহিতে থাকে। ঐ বায়ুকে **সমুদ্র বায়ু** (sea breeze) বলা হয়। বেলা যত বাড়িতে থাকে তত এই বায়ুপ্রবাহ প্রবল হয় এবং সন্ধ্যার দিকে ইহা প্রবলতর হইতে থাকে। আবার রাত্রে ভূপৃষ্ঠের বায়ু তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয় কিন্তু সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ু এত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হইতে পারে না। তখন স্থলভাগের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাস সমুদ্রদিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহকে **স্থল বায়ু** (land breeze) বলা হয়। উপকূলীয় অঞ্চলে এইরকম বায়ুপ্রবাহের ফলে জলবায়ু চরমভাবাপন্ন অর্থাৎ বেশী ঠাণ্ডা বা বেশী গরম হইতে পারে না। এই অঞ্চলে এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। জুন হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃষ্টিপাত বেশী। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বেশী বৃষ্টিপাত হয় এবং ঐ সময় ঘূর্ণীবাত্যা দেখা যায়। এই বৃষ্টিপাতের জন্য স্বভাবজ অরণ্য দেখা যায়। অবশ্য কোথাও কোথাও অরণ্য পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য চলে। সমুদ্র উপকূলের জলবায়ু আর্দ্র বলিয়া সুতাকাটা সহজ এবং বস্ত্র-বয়ন শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। বোম্বায়ের শিল্পাঞ্চলে এই শিল্পে লক্ষ লক্ষ লোক কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে বাঁচিয়া থাকে।

আবার অরণ্যগাত্রে রবার, আবলুস, প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। এখানের

সেগুন কাঠ সমধিক প্রসিদ্ধ। আবার এই অঞ্চলের অরণ্যভূমিতে নানাপ্রকার জীবজন্তু রহিয়াছে ; তাহার মধ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, হরিণ, সম্বর, কালো হরিণ ও বন্য শূকর প্রধান।

পশ্চিম উপকূলে কেরল রাজ্যের এক বৈশিষ্ট্য আছে। এই রাজ্যে জাতিভেদ ও বৈষম্য সর্বজনবিদিত। উপকূলের স্থানে স্থানে লবণ-জলের উপহ্রদ রহিয়াছে। **কোচিন** বন্দর ও **এম্বানার্ড** হ্রদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে মাকড়া পাথর (Lateritic) রহিয়াছে। ঘাস ও গুল্ম আচ্ছাদিত এই অঞ্চল ধীরে



ধীরে **আনামালাই** ও **কার্ডামম** পাহাড়ে মিশিয়া গিয়াছে। কেরল রাজ্যে নিরক্ষীয় জলবায়ুর প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন গ্রীষ্ম অনুভূত হয় আবার সেই পরিমাণে বৃষ্টিও উল্লেখযোগ্য। এর বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ১২০"।

কেরলের সর্বত্র ধান উৎপন্ন হয়। দক্ষিণাঞ্চলে খালের জলে কৃষিকাজ হয়। এই উপকূলে চাষের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

(১) কেরলের দক্ষিণে **সেনেকোট্টা** তালুকে বৎসরে দুইবার ধান চাষ হয়, একবার সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে, আর একবার ফেব্রুয়ারি-মার্চে। এই অঞ্চলে **তুলা ও চীনাবাদাম** উৎপন্ন হয়।

(২) **পুনজা ও কোল** অঞ্চলে জল আবদ্ধ হইয়া থাকার জন্য তাহা বাহির করিবার বিশেষ সুবিধা নাই। সেইজন্য উচু বাঁধ দিয়া খাল কাটা হইয়াছে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সমস্ত অঞ্চল জলে প্লাবিত হইয়া যায়। ধীরে ধীরে ঐ জলকে বাঁধের এক পাশে সরাইয়া দিয়া পার্শিয়ান হুইল বা পাম্পের সাহায্যে জল তুলিয়া চাষের কাজ চলে। ঐ অঞ্চলে ভূমি বেশ নীচু। কোন কারণে বাঁধ ভাঙিয়া গেলে সমস্ত শস্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) কোচিন-মালাবার সীমারেখায় জমিও বেশ নীচু। ঐ অঞ্চলের মাটি লবণাক্ত বলিয়া এক ফুট উচু ও পাঁচ ফুটের মত বৃত্তাকার শস্যক্ষেত্র তৈয়ারী করা হয়। বর্ষার পূর্বে বীজ বপন করা হয়। বর্ষায় মাটির লবণ ধুইয়া যায়। এই প্রথায় চাষ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, তবুও স্থানীয় অধিবাসীরা এই ভাবে দীর্ঘকাল চাষ-আবাদ করিয়া আসিতেছে।

(৪) আবদ্ধ জলের উপরের ভূমিতে মৌসুমী-বৃষ্টির প্রাক্কালে চাষের কাজ হয় এবং সেপ্টেম্বরে ফসল ঘরে তোলা হয়। যদি বৃষ্টির সুবিধা থাকে তবে আবার জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয়বার ফসল তোলা হয়। অবশ্য দ্বিতীয় বারে ফলন যথেষ্ট হয় না।

কেরল অঞ্চলের নারিকেল অন্যতম উৎপন্ন দ্রব্য। কেরলের নারকেল ছোবড়ার কারখানা ও দ্রব্যসামগ্রীর ভাল বাণিজ্যিক মূল্য আছে। এ ছাড়া **ট্যাপিওকা** অন্যতম উৎপন্ন দ্রব্য—মাকড়া পাথরের অনুর্বর অঞ্চলে ইহা উৎপন্ন হয়। কৃষি ছাড়া অন্যান্য উপজীবিকা হইল **মৎস্য শিকার**। আদিম উপায়ে মাছ ধরা ছাড়া পোর্তুগীজ প্রভাবান্বিত 'চানা জালে' মাছ ধরা প্রচলিত হয়। মাছ ধরার জন্য নানা রকমের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।

কেরল অঞ্চলের গ্রামগুলি অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন। উর্বর কৃষিক্ষেত্রের অভাব এবং অধিবাসীদের বেশী পরিমাণ আবাদী জমি নাই। ভূমির গঠন, বৃষ্টিপাত ও চাষের ধরনের সামঞ্জস্যের মধ্যে মে হইতে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সাধারণ লোকের

কিছু অবকাশ থাকে। কেননা ঐ সময় চাষের কাজ হয় না আবার মাছ ধরারও সুবিধা নাই। .কাজুবাদাম, নারিকেল ছোবড়ার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

কেরলের শহরগুলির মধ্যে **তেলিচেরি, খজিকোর্ডে** বাণিজ্যিক গুরুত্ব আছে। **কোচিন, ম্যাটানচেরি, এরনাকুলাম** হইল প্রধান শহর। **ত্রিচুরে** কয়েকটি কাপড়ের কল আছে আর **ত্রিবান্দ্রাম** হইল এই রাজ্যের রাজধানী। **এলাপ্পি** ও **কুইলন** বন্দরের সহিত স্থলপথে রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ আছে।

ভারতের উপকূল বন্দর ও বাণিজ্য

ভারতের পশ্চিম উপকুলে কচ্ছ ও কাম্বে উপসাগর আছে। এই দুইটি উপসাগর আরব সাগরের তটভাগে অবস্থিত। কচ্ছের রান অগভীর এবং ইহা লবণ জলে পূর্ণ। সম্প্রতি এই উপসাগরের একটি খাঁড়ি বাছিয়া লইয়া তাহাতে **কান্দলা** নামে বন্দর সৃষ্টি করা হইয়াছে। কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে ওখা ও ভাবনগর নামে দুইটি বন্দর আছে। জাহাজ যাহাতে নোঙর করিতে পারে তাহার জন্য জেটি আছে। সুরাট ও ব্রোচ বন্দর নদীর মুখে ভাল বন্দর। বোম্বাই বন্দরে অনেক সময় বড় জাহাজ নোঙর করে। আবার ম্যাংগালোর অনেকটা অরক্ষিত বন্দর। ঝড়ের সময় জাহাজগুলি ঠিকমত থাকিতে পারে না।

সম্প্রতি উপকূল বাণিজ্য যথেষ্ট বাড়িয়াছে। বোম্বাই হইতে কার্পাস বা পেট্রোলিয়াম জাহাজে করিয়া কলিকাতায় আসে। সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ হইতে যথেষ্ট লবণ আমদানি হয়। সস্তায় জিনিস পত্র বহিবার জন্য উপকূল বাণিজ্যের গুরুত্ব অধিক। আবার পশ্চিম উপকূলে পশ্চিমঘাট পর্বতের জন্য সড়ক বা রেলপথ ব্যয়সাধ্য। বোম্বাই হইতে তেল বহিবার জন্য জাহাজ রহিয়াছে।

উপকূল ও জনজীবন

পশ্চিমের উপকূলে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা লম্বালম্বিভাবে চলিয়া গিয়াছে। বৃষ্টিপাতের ধরণ অনুযায়ী কৃষিকার্য্য ঐ অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোকের প্রধান উপজীবিকা। অবশ্য শহর বা বাণিজ্য কেন্দ্রিক অঞ্চলে কৃষিজীবনের প্রভাব

নাই। ধান বাদে পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন অঞ্চলে চা ও কফি উৎপন্ন হয়। আবার অন্যান্য কতকগুলি অঞ্চলে রবার ও নানা রকম মশলার চাষ হয়। ফলের দিক দিয়া দেখিলে নারিকেল, আম, সুপারী আবার নানাপ্রকার তৈলবীজ ও তামাকের চাষ এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। এই সকল কৃষিজ ফসল ও মানুষের জীবন ধারার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে তূলা চাষ হয়। সেই তূলা বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে সুতা তৈরী ও বস্ত্র-শিল্পের জন্য প্রেরিত হয়। কেননা আর্দ্র জলবায়ুর জন্য সুতা তৈরী সহজ, সুতোতে টান লাগিয়া ছিঁড়িয়া যাইতে পারে না। আবার শিল্পাঞ্চলের মানুষগুলির নিত্য খাদ্য শাক-শব্জী ও ফল স্থানীয় অঞ্চল হইতে আসে। সুতরাং কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া যে জীবন তাহা কেবল যে তাহাদের নিজেদের অভাব মিটাইতে চলিয়াছে তাহা নয় বরং শিল্পাঞ্চলের মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে।

গুজরাট ও সুরাট অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস জন্মিয়া থাকে। ঐ ঘাস থাকার জন্য কিছু কিছু লোকের পশুপালন প্রধান উপজীবিকা। ফলে দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য ঐ অঞ্চলে অতি সহজে পাওয়া যায়।

উপকূলের অধিবাসীর এক বিশেষ গোষ্ঠী সমুদ্রে মৎস্য শিকার করিয়া থাকে এবং মৎস্য **আহরণ** তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। এই মাছ পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চলে সরবরাহ করা হয়।

ভারতের অন্যান্য স্থানের মত খনিজ অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া কিছু কল-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে ঐ অঞ্চলের জনজীবনে কলকারখানার প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। কেরালা অঞ্চলে নানাবিধ খনিজ দ্রব্যের মধ্যে অভ্র, মোনাজাইট, সিলি ম্যানাইট এবং ইল ম্যানাইট উল্লেখযোগ্য। আবার হোয়াইট ক্লে হইতে ভাল রকম ইট তৈয়ারী হয়। কিছু কিছু গ্রাফাইট ও লোহার আকর এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। সমুদ্রে উপকূলে যে লাইম শেল পাওয়া যায় তাহা সিমেন্টের কারখানায় ব্যবহৃত হয়। মহীশূর, মহারাষ্ট্র অঞ্চলে লৌহ, বক্সাইট, চূনাপাথর পাওয়া যায়। এই সকল খনিজ পদার্থকে কাজে লাগাইবার জন্য শিল্প প্রসার সুগম হইতেছে।

এই উপকূলের প্রধান বন্দর হইল **বোম্বাই**। বোম্বাই একটি বৃহৎ শিল্পাঞ্চল। প্রায় ৩৫০০টির অধিক কলকারখানা বোম্বাই বা বোম্বাই-এর

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রহিয়াছে। কল্যাণ ও ট্রম্বেতে আছে তাপবিদ্যুৎ কারখানা। ইহা ব্যতীত কার্পাস বয়নশিল্প, রেয়ন শিল্প, ঔষধ শিল্প, চলচ্চিত্র নির্মাণ শিল্পগুলি হইল অন্যতম। বোম্বাইতে একটি মোটরগাড়ী নির্মাণের কারখানা আছে।

এইভাবে দেখা যায় এক একটি প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া জনজীবন গড়িয়া উঠিতেছে।

কেরল অঞ্চলের আদিবাসীরা অরণ্য নির্ভর গোষ্ঠী। তাহাদের মধ্যে কাদর হইল প্রধান যাহাদের দেহে আদিম নিগ্রো জাতীয় প্রভাব আছে বলিয়া অনেকের ধারণা। এছাড়া ইরুলা, কুরুম্বা, বিসভান, কানিকার হইল অন্যতম।

অনুশীলনী

১। পশ্চিম উপকূলকে সাধারণত কয়টি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে?
২। পশ্চিম উপকূলের প্রধান শহর কি?
৩। পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থার উল্লেখ কর।
৪। বদলী প্রথায় চাষ বলিতে কি বুঝায়?
৫। ঐ অঞ্চলের অরণ্যজাত দ্রব্য কি?
৬। কেরল অঞ্চলে নারিকেল ছোবড়ার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে কেন?
৭। কেরল অঞ্চলের কয়েকটি শহরের নাম কর।
৮। পশ্চিম উপকূলের অধিবাসীদের বিভিন্ন অর্থনীতিক জীবন বর্ণনা কর।
৯। পশ্চিম উপকূলীয় বাণিজ্য সম্পর্কে বিবরণ দাও।
১০। উপকূলে প্রধান বন্দর কী, তাহার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা

ভূ-প্রকৃতির গঠন বৈচিত্র্যে এমন এক একটি অংশ যাহা স্বাভাবিকভাবে দুই উন্নত ভূমির মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিম্ন অথচ বিস্তৃত সেই ভূভাগই উপত্যকা হিসাবে পরিচিত। ভৌগোলিকেরা উপত্যকার অবস্থান অনুযায়ী সেগুলিকে নানা-ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

পার্বত্য উপত্যকা বলিতে (Mountain Valley) দুই পর্বতের উচ্চ-অংশের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত নিম্ন অংশকে বর্ণনা করা হয়। সাধারণত ভূসংক্ষোভের ফলে ভূপৃষ্ঠে ভাঁজের সৃষ্টি হয় ফলে উহার দুইদিক উচু হইয়া উঠে। মধ্যের নিম্নভূমিকে আমরা পার্বত্য উপত্যকা বলিয়া থাকি। আবার অনেক সময় মধ্যবর্তী কোন অংশ ভূ-চ্যুতির ফলে বসিয়া গিয়া এক বিস্তীর্ণ নিম্নাঞ্চল সৃষ্টি করে। তাহাকে **গ্রস্ত উপত্যকা** (Rift Valley) বলা হয়। নদী তাহার উৎপত্তি স্থান হইতে প্রবলবেগে প্রবাহিত হওয়ায় পথে অনেক সময় ভূমি ভাগে খাত সৃষ্টি করে। পরে পলি জমিয়া সেই স্থান সুবিস্তীর্ণ হয়। কিন্তু সেই বিস্তীর্ণ নদী বিধৌত অঞ্চলকে আমরা **নদী উপত্যকা** (River Valley) বলিয়া থাকি। আবার শীতের দেশে হিমবাহ নামিয়া আসিবার সময় তাহার পথকে ক্ষয়প্রাপ্ত করিয়া যে খাতের সৃষ্টি করে তাহাকে হিমবাহ উপত্যকা (Gacial Valley) বলা হয়। এই উপত্যকাগুলি স্থানীয় জীবনে নানা প্রভাব বিস্তার করে এবং পার্শ্ববর্তী মানুষও সে সকলকে নানাভাবে কাজে লাগাইয়া অভিযোজন করিয়া থাকে। কখনও বা গমনাগমনের পথ, কোথাও বা সুসমৃদ্ধ জনপদ এই সকল উপত্যকাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা** এই রকম এক **সুসমৃদ্ধ** অঞ্চল।

প্রায় ১৭০০ মাইল দীর্ঘ ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের

দক্ষিণাঞ্চলের মানস সরোবর হ্রদ অঞ্চল হইতে বাহির হইয়াছে। ইহার নাম **সাঁপো**। প্রায় ৯০০ মাইল পরে **নামচা বাড়োয়া** পর্বতশৃংগের নিকট বাঁকিয়া আসামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সমভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই অংশ **ডিহং** নামে পরিচিত। এরপর আসামের উত্তরাংশে উপত্যকার মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। তখন হইতে ইহার নাম **ব্রহ্মপুত্র**। এই নদী ডিহং-এর নিকট প্রায় ১৮০০০ ফুট গভীর খাঁড়িতে পতিত হইবার জন্য খরস্রোতা। ডিব্রুগড় হইতে ব্রহ্মপুত্রের নদীর দুইপাশে অনেক চরের সৃষ্টি হইয়াছে। পরে ব্রহ্মপুত্র নদ গারো পাহাড়ের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণদিক দিয়া বাংলাদেশে **মেঘনা** নামে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সংগে মিলিয়া বংগোপসাগরে পড়িয়াছে। আসামের পর্বতাঞ্চল হইতে যে সকল নদী ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে তাহার মধ্যে **ডিবাং, লোহিত, ডিহং, দয়ানা কাপিলি** এবং হিমালয় হইতে উৎপন্ন নদীগুলির মধ্যে **সুবর্ণশ্রী, মানস, তিস্তা** ও **তোর্ঙা** প্রধান।

ব্রহ্মপুত্র নদী যেখানে তিব্বত হইতে আসামে প্রবেশ করিয়াছে সেইখান হইতে পশ্চিম দিকে বাংলাদেশের সীমা পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মাইল দীর্ঘ ও ৫০-৬০



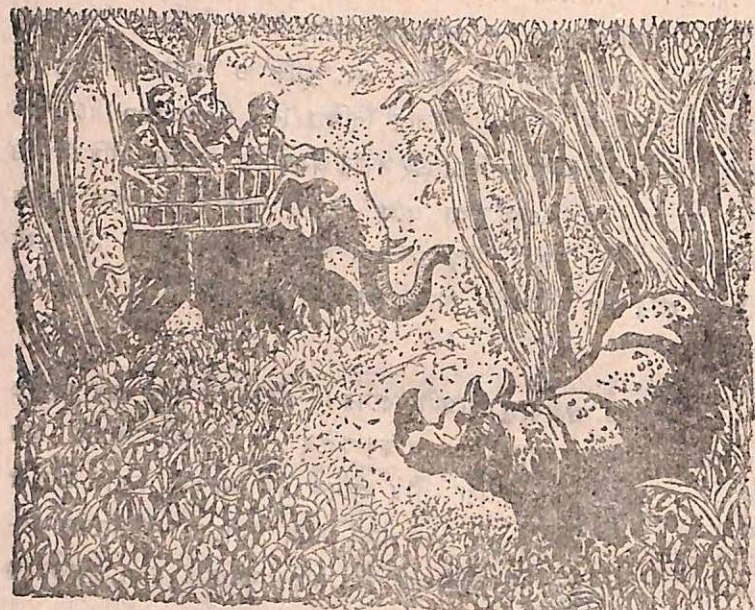
মাইল প্রস্থবিশিষ্ট এই অঞ্চল **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা** বা **আসাম উপত্যকা** বা **উত্তর আসাম** (Upper Assam) বলিয়া পরিচিত। এই উপত্যকার

জমি অত্যন্ত উর্বর কেননা ব্রহ্মপুত্রের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখানদী ইহার সংগে মিলিয়া ইহার পাশাপাশি অঞ্চলকে সবুজ ও প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের এই অংশ **টারশিয়ারি** শিলায় গঠিত। **নাগাপাহাড় ও পাটকই** পাহাড়শ্রেণীর অবিন্যস্ত শৈলস্তরের সংগে শিলং পাহাড়ের সাদৃশ্য আছে এবং ধুবড়ি ও গৌহাটির মধ্যবর্তী ব্রহ্মপুত্রের আশপাশে ঐ একই শিলার বিক্ষিপ্ত শির (outcrop) দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও শীতের দিনে এই নদীর জলস্ফীতি অত্যন্ত সীমিত তবুও গ্রামে বরফগলা জল এবং বৃষ্টির জলে এই নদী তাহার দুই কূলকে প্লাবিত করে এবং তখন ইহার বিস্তৃতি ৫-৬ মাইলের বেশী হয়। এমন কী মৌসুমী বৃষ্টির পর গৌহাটির নিকট ব্রহ্মপুত্রের জলস্ফীতি ১০-১৫' পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়

এই অঞ্চলের **জলবায়ু** মৌসুমী ধরনের। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম অনুভূত হয় অবশ্য গ্রীষ্মকাল স্বল্পস্থায়ী। দক্ষিন-পশ্চিম কালবৈশাখী ঝড়ের জন্য গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া গ্রীষ্ম অনেক কম অনুভূত হয়। প্রায় ঐ সময়ে ১০"-২০" বৃষ্টিপাত হয় এবং তাহা সারা বৎসরের বৃষ্টিপাতের এক-পঞ্চমাংশ। জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত অধিক বৃষ্টিপাত হয়। স্বাভাবিক ভাবে বৃষ্টিপাত অধিক বলিয়া গভীর অরণ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

গ্রীষ্মের এই বৃষ্টিপাত **চা** চাষের পক্ষে অত্যন্ত ভাল। আসাম উপত্যকার দক্ষিণাংশ অনেকটা **বৃষ্টিছায়** অংশের মত কেননা যেখানে শিলং-এ সারা বৎসরে প্রায় ১৬০" বৃষ্টিপাত হয় ঠিক গৌহাটিতে ঐ সময়ে বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ৬৭"। এই উপত্যকার দক্ষিণ সীমা ঘেঁষিয়া চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ৪২৮" ইঞ্চি অর্থাৎ ১০·৭ মিটার। খরস্রোতা হিমালয় উদ্ভূত নদীগুলি ব্রহ্মপুত্রকে আরও বেগবতী করিয়া দক্ষিণবাহিনী করিয়াছে। এই উপত্যকার বেশীর ভাগ অংশ সাল, শিশু, জারুল, সিমূল, সেগুন ও গর্জন গাছের জংগল। আর একটু নীচের দিকে পাদদেশে বা জলা জমিতে নানাপ্রকার বাঁশ, বেত ও নানাধরনের নল-খাগড়ার জংগল দেখিতে পাওয়া যায়। অরণ্যের নরম কাঠ হইতে প্যাকিং বাক্স তৈরী হয়। কাগজ তৈরীর জন্য বাঁশ বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়। এই অঞ্চলের অরণ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, বন্য মহিষ, বাইসন, ভালুক প্রভৃতি জীবজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। হাতি,

একখড়্গ বিশিষ্ট গণ্ডার এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট কাজীরংগাতে বন্যপশু সংরক্ষণ কেন্দ্র আছে।



হাতীর পিঠে থেকে একখড়্গ বিশিষ্ট গণ্ডার দেখা

আসাম অঞ্চলের সমভূমিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে **ধান, পাট, রাই, সরিষা** উৎপন্ন হয়। পাহাড়ের ধাপে যেমন আদিবাসীদের গ্রাম ঠিক তেমনি সমভূমিতে অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকের বাস। সেই গ্রামগুলিতে **কাঁঠাল, আম, পেঁপে, কলা,** আনারস ও কমলা প্রভৃতি ফলের বাগান আছে।

আসামের অন্যতম বৃহৎ শস্য-পণ্য হইল **চা**। পাহাড়ের ধাপে আর কোথাও বা অপেক্ষাকৃত সমভূমিতে চায়ের চাষ হয়। চায়ের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ প্রায় ৪০০,০০০ একর (১৬২,০০০ হেক্টর)। মোট প্রায় ৮০০টি চায়ের বাগিচা বিভিন্ন মালিকানায় রহিয়াছে। এই চায়ের পরিমাণ সর্বভারতীয় চায়ের অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ৩০০,০০০ টন আর এই চায়ের বাগানে প্রায় ১,৫০০,০০০ লোক কাজ করিয়া থাকে। এই চা-শিল্পের ইতিহাস অন্য রকম। চীন দেশ হইতে চা-গাছ ভারতে আমদানি করা হয়। পরে আসামের জংগলে চা গাছের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাহাই বাগানে পরিণত

করিবার চেষ্টা করা হয়। সাধারণত পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অথচ জল জমিয়া থাকে না সেখানে চা চাষ করা হয়। ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকা চা চাষের প্রকৃষ্ট জায়গা। অবশ্য উত্তরবংগে ডুয়ার্সেও এই চা চাষ করা হয়। এক কথায় ভংগুর মাটি ও প্রচুর রৌদ্রতাপ এই দুই চা উৎপাদনের পক্ষে ভাল। বিভিন্ন অঞ্চলের চায়ের পাতায় সকল প্রকার গুণ



চায়ের পাতা তোলা

থাকে না বলিয়া নানাবিধ চায়ের পাতা মিশাইয়া এক ধরনের চা তৈয়ার করা হয় এবং বাজারে ঐ রকম চায়ের আদর বেশী। চা-পাতা বলিতে একটি কুঁড়ি ও দুইটি পাতা—যাহা শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হয়। যাহাতে চায়ের গন্ধ উড়িয়া না যায় সেজন্য চা-কে অতি ভালভাবে প্যাক করিতে হয়। সাধারণত কাঠের বাক্সে বা রাংতা কাগজে মুড়িয়া দিলে চা ভাল থাকে। রেলপথে, নৌকা অথবা বিমানে এই চা বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়। চা চাষ করা কোন এক একক কৃষকের পক্ষে সম্ভব নয়। ছয় মাস হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত চা গাছের চারাগুলিকে বাগানে অত্যন্ত যত্নসহ পরিচর্যা করিতে হয়, পরে চার-পাঁচ হাত অন্তর রোপণ করিয়া বাগিচার সৃষ্টি করিতে হয়। বেশী

পরিমাণ পাতা পাইবার জন্য গাছগুলিকে কাটিয়া ঝাঁকড়া করিতে হয়। সেইজন্য চায়ের পাতা তুলিয়া লইবার পর গাছকে ঠিকভাবে কাটা দরকার। তাহার পর বিশেষ সময়ে পাতা সংগ্রহ করিবার জন্য পুরুষ ও স্ত্রী উভয় শ্রমিক কাজ করে। বিভিন্ন অঞ্চলের সস্তায় শ্রমিক আসে এবং তাহাদের জীবনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকজনের প্রভাব রহিয়াছে। আসামের **ডিব্রুগড়, শিবসাগর, লখিমপুর** ও **কাছাড়ে** চায়ের বাগান অবস্থিত।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রচুর কমলালেবু উৎপন্ন হয়। কমলালেবু ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ফল হইল আনারস, কাঁঠাল, নাসপাতি এবং আপেল। গ্রীষ্মের দিনে আসামের এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে প্লাম বা কুল পাওয়া যায়। এই সকল ফল কেবল স্থানীয় বাজারে চাহিদা মিটায় না। কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে যায়।

স্বভাবজ অরণ্য অরণ্য সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া নানা কুটির শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মুগা, এণ্ডি বা রেশমের কাপড় এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ শিল্প। ইহা ছাড়া হাতির দাঁতের কাজ, লাক্ষা, নানাপ্রকার মূল্যবান পাথর ও আসামের অরণ্যে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কাঁসা ও পিতলের জিনিসপত্র তৈয়ার হয়। স্থানীয় লোকেরা এইভাবে কুটির শিল্পের মাধ্যমে যথেষ্ট রোজগার করিয়া থাকে।

আসামের তিনসুকিয়ার নিকটবর্তী লাজিরা ও মাকুম নামক স্থানে নিকৃষ্ট ধরনের কয়লা পাওয়া গেলেও তেলের উৎস বহু পুরাতন। অনেকের মতে ১৮২৮ খৃস্টাব্দে আসামের জংগলে প্রথম তৈলের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। আসামের তেলের প্রধান উৎস কেন্দ্র হইল **ডিগবয়**। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এই অঞ্চলের নিকটবর্তী **নাহারকাটিয়া, মোরান,** ও **রুদ্রসাগর** উল্লেখযোগ্য। ঐ তেলের খনি হইতে তেল আনিয়া কিছু ডিগবয়ের শোধনাগারে পরিশোধিত করা হয়। কিছু অংশ গৌহাটির নিকটবর্তী **নুনমাটি** শোধনাগারে এবং সম্প্রতি **পাইপ লাইন** দিয়া **হলদিয়া** শোধনাগারে শোধনের কাজ আরম্ভ হইতেছে। আসামের শোধনাগারে মূলত পেট্রোল, কলকব্জা পরিষ্কার করিবার তেল, কেরোসিন ও মোম পাওয়া যায়। **বারুণির** শোধনাগারে অবশ্য কিছু তেল পরিশোধিত হয়।

ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলের প্রধান শহর হইল **ডিগবয় ও গৌহাটি**। ব্রহ্মপুত্র নদী নাব্য হওয়ার ফলে গৌহাটি হইতে নৌকাপথে ভাল ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। সম্প্রতি জাতীয় সড়ক নির্মিত হওয়ার ফলে গৌহাটির সহিত স্থলপথে যাতায়াত সুগম হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ তীরে **সাদিলাপুরে** একটি নদী-বন্দর গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা ছাড়া **তেজপুর, শিবসাগর, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, ধুবড়ী** প্রভৃতি অঞ্চলগুলির বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে সুখ্যাতি আছে।

জনসমষ্টি ও লোকজীবনের ধারা

আসাম অঞ্চলের আদিম গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কাছাড়ি, মিজো, মেচ, গারো প্রভৃতি প্রধান। তাহাদের দেহে মংগোল প্রভাব অধিক লক্ষ্য করা যায়। এই সব স্থানীয় উপজাতি গোষ্ঠীগুলি প্রকৃতি পরিবেশের সংগে সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবন অতিবাহিত করে। যদিও সরকারী নানা উন্নয়ন প্রকল্পে ইহাদের জীবনে নানা পরিবর্তন আসিয়াছে। অনেকে চা শিল্পে জীবন কাটায়। যদিও চা বাগানে ভারতের অন্যান্য রাজ্য হইতে আগত বহু উপজাতি বিশেষভাবে সাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডা, মহালী ও হো-দের সংখ্যা বেশী।

প্রকৃতি নির্ভর মানুষগুলি ধীরে ধীরে প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। সেইজন্য কৃষি, বাগান ও চা-বাগিচার কাজে তাহাদিগকে সমধিক উৎসাহী দেখা যায়। আবার যাহারা অরণ্যের গভীরাঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে তাহারা **ঝুম** পদ্ধতিতে চাষ করে। কখনও বা পাহাড়ের গা কাটিয়া খানিকটা সমভূমি বাহির করিয়া লয় এবং এইভাবে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চাষ (Terrace cultivation) ঐ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

মোটকথা উন্নত কৃষি ব্যবস্থার প্রভাব ইহাদের জীবনে নাই বলিয়া মোটা-মুটিভাবে তাহারা আদিম প্রথায় কৃষিকার্য নির্বাহ করে।

অনুশীলনী

১। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বলিতে কী বুঝায়?

২। ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

৩। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জলবায়ু বর্ণনা কর।

৪। চা শিল্পের ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা কর। চা শিল্পের ইতিহাস আলোচনা কর।

৫। আসাম অঞ্চলে খনিজ তেল কোথায় কোথায় পাওয়া যায়?

৬। এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ বন্য প্রাণীগুলি কী কী? কোথায় বন্যপশু সংরক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে?

৭। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আর কী কী শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়?

৮। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একটি মানচিত্র অংকন করিয়া প্রধান নগরগুলি দেখাও।

৯। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জন-জীবনের বিবরণ দাও।

১০। উপত্যকাকে আমরা কতকগুলি ভাগে ভাগ করিতে পারি বুঝাইয়া বল।

---

১০ উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজ্য

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল পাহাড় ও অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। এই অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর বাস। প্রতিটি উপজাতির সাংস্কৃতিক জীবনে যথেষ্ট প্রভেদ থাকায় এই অঞ্চলে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার পূর্বে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য বৃহত্তর আসামের সহিত সংযুক্ত ছিল। সীমান্ত অঞ্চল বলিয়া ভারত সরকার এই সকল রাজ্যগুলির অধিবাসীদের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া পৃথক রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছেন। নাগাভূমি, মেঘালয়, মণিপুর ও ত্রিপুরা ছাড়া অরুণাচল ও মিজোরাম উল্লেখ-যোগ্য। নাগাভূমির পূর্বাংশে রহিয়াছে ব্রহ্মদেশ। এই রাজ্যগুলির মধ্যে ভূ-প্রকৃতির তারতম্য সহজে নজরে পড়ে না। কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাতের জন্য পাহাড়ের গায়ে গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদী, ঝরনা এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। উঁচু-নীচু ঢেউখেলান অরণ্যা-কীর্ণ পাহাড়। ঝরনা ও নদী এই অঞ্চলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। অবশ্য এই অঞ্চলের অরণ্যের মধ্যে শাল, সেগুন, খয়ের, বাঁশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শীতের ঠিক অব্যবহিত পরে অনেক গাছের পাতা ঝরিয়া যায় আবার বসন্তের আগমনে নতুন পাতায় ও ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠে। এই পাতা পড়িয়া যাওয়ার জন্য এই সকল উদ্ভিদকে **পর্ণমোচী** উদ্ভিদ



নাগা বর্শা

বলা হয়। এখানের বেশীর ভাগ পাহাড়ী উপজাতিরাই প্রধান। তাহাদের জীবনে সাহসিকতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার এই সকল জংগলে, নানা প্রকার হিংস্র জন্তু আছে। সে সকলের পটভূমিতে এখানের অধিবাসীদের জীবন ও মন বৈচিত্র্যপূর্ণ। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে **নাগাভূমি, মণিপুর, মেঘালয় ও ত্রিপুরা** রাজ্যপাল শাসিত।

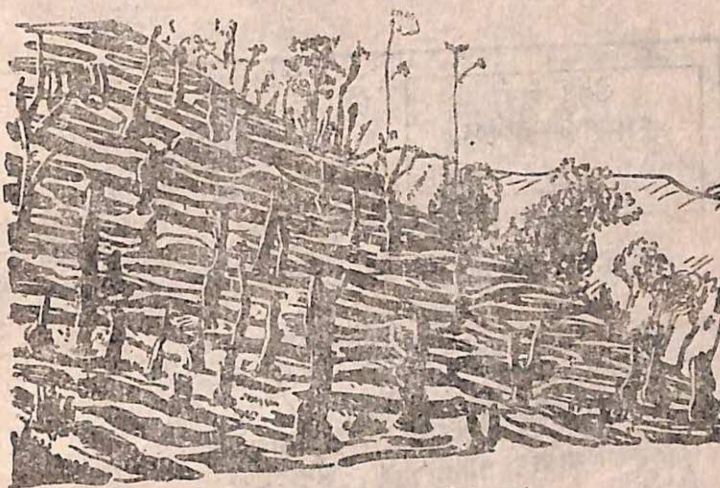
নাগাভূমি

এই নাগাভূমির সর্বত্র ঢেউ খেলান পাহাড় কোথাও বা বেশ উচ্চ আর নাগাভূমির তুয়েনসাং জেলায় ব্রহ্মদেশের সমীপবর্তী সরোমাটি উচ্চতম শৃংগ (৩৮৪০ মিটার) কোথাও বা অনুচ্চ। আসাম রাজ্যের গা ঘেঁষিয়া যে অঞ্চল তাহা অনেকটা সমভূমির মত। পার্বত্য অঞ্চলের আবহাওয়া শীতল এবং নাতি-শীতল কিন্তু পাহাড়ের পাদদেশের জলবায়ু বেশ গরম।

পূর্ব হিমালয়ের পর্বতগ্রন্থি **পাটকই** নাগা, লুসাই ধীরে ধীরে ব্রহ্মপুত্রে প্রবেশ করিয়াছে। নাগা পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমে বরাইল পর্বত তাহা হইতে জয়ন্তিয়া, খাসিয়া, গারো পাহাড় রহিয়াছে। পাহাড়গুলি হইতে ছোট ছোট নদী বাহির হইয়াছে। এই অঞ্চলে ভূমিকম্পের প্রকোপ আছে।

নাগাভূমিতে আদিম প্রথায় দুই রকম চাষ লক্ষণীয়। প্রথম প্রথার চাষ হইল ঝুম (Jhum), এই প্রথায় চাষের বৈশিষ্ট্য হইল (১) ঝুম চাষের জন্য একটি নির্দিষ্ট পাহাড় বা উপত্যকার একটি অংশ কয়েকটি পরিবার বাছিয়া লয়, ঠিক শীতের শেষে ঐ অংশটির গাছগুলি কাটিয়া পরিষ্কার করা হয়। সাধারণত কুড়ুল, দা এই সকল ধারাল অস্ত্র সাহায্যে জংগল পরিষ্কারের কাজ চলে। অবশ্য অনেক সময় বড় বড় গাছ কাটিয়া রাখা হয়। তখন ঐ অংশের গাছপালা শুকাইতে আরম্ভ করে। তারপর গ্রীষ্মের প্রথমে যখন ঐ কাটিয়া রাখা গাছপালা শুকাইয়া যায় তখন তাহাতে আগুন দেওয়া হয়। আগুনে ঐ সব পুড়িয়া যায় এবং ছাই সারের মত ব্যবহৃত হয়। ঐ ছাইকে ঝুম ক্ষেত্রের সর্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তারপর বৃষ্টি নামিবার সংগে সংগে কোদাল, গাঁতি প্রভৃতি দিয়া মাটি কোপান হয় এবং বীজ বোনা চলে। ধান, মকাই, ভুট্টা প্রভৃতি প্রধান শস্য। এক একটি ঝুম ক্ষেত তিন বৎসর পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। এরপর ঐ জমির আর উর্বরতা থাকে না বলিয়া কৃষকেরা ঐ জমিতে জংগল

গজাইবার জন্য ছাড়িয়া দেয় এবং পুনরায় আট-দশ বৎসর পরে ঐ জমি ব্যবহৃত হয়। এই **পরিবর্তিত পাহাড়ী চাষ** (Shifting Hill Cultivation)



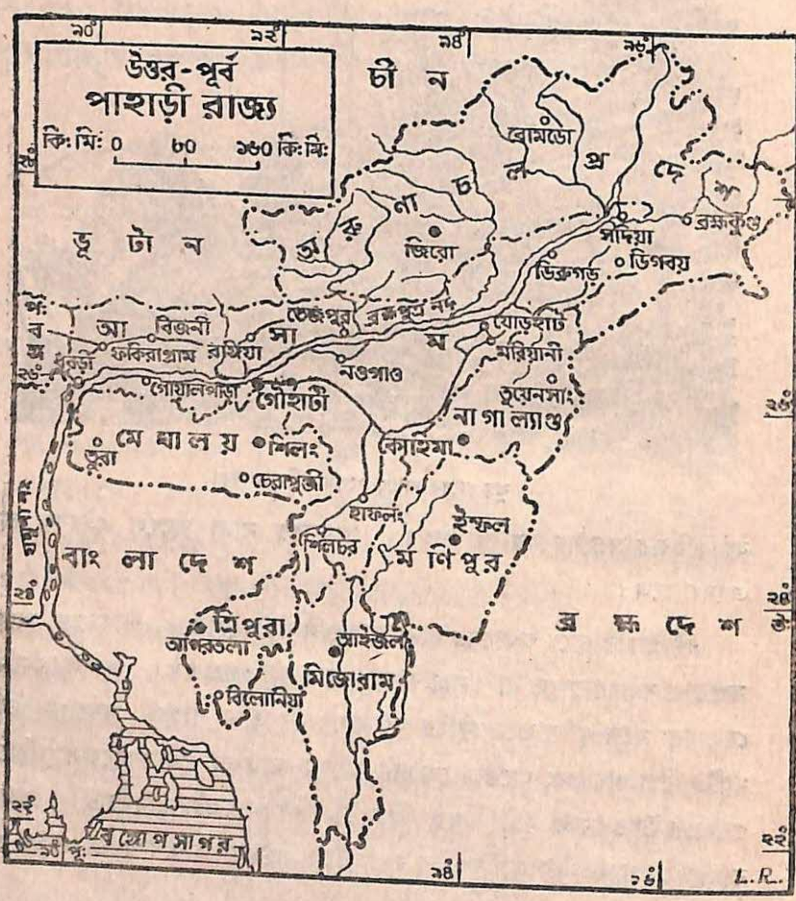
ঝুম চাষের আগে জংগল পরিষ্কার করা

বন্ধ করিবার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। ভারতের নানা অঞ্চলে এইরকম চাষ এখনও চলে।

এই প্রকার চাষে জংগলের দামী গাছগুলি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে অরণ্য সম্পদের সদ্ব্যবহার হয় না বলিয়া রাজ্য প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জংগল কাটিয়া দেওয়ার ফলে বৃষ্টির জলে ভূমির ক্ষয় সাধন হয় তখন পাহাড় অঞ্চলের উর্বর মাটি সরিয়া যায় এবং মাঝে মাঝে ধ্বস নামে। আর এই প্রথার চাষে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া উৎপাদন অনেকটা অনিশ্চিত। সেজন্য নানাভাবে পার্বত্য উপজাতিগুলির মধ্য হইতে এইভাবে চাষ করিবার চেষ্টা বন্ধ করা হইতেছে।

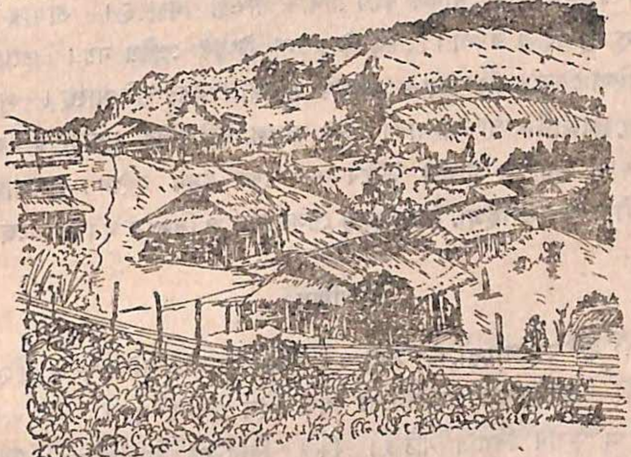
নাগাভূমিতে আর এক রকমের চাষ হইল পাহাড়ের **ধাপে ধাপে (Terrace) চাষ**। পাহাড়ের গা কাটিয়া খানিকটা অঞ্চল পরিষ্কার করিয়া আল বাঁধ দেওয়া হয়। তাহাতে বর্ষাকালে জল গড়াইয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে গোটা পাহাড়ের পাদদেশ ধাপে ধাপে কাটিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষের জমি বাহির করিয়া লওয়া হয়। দূর হইতে দেখিলে সারা পাহাড়টিকে একটি কৃষিক্ষেত্র মনে হইবে, এই স্বল্পপরিসর চাষের ক্ষেতগুলিতে

লাঙল চাষ হয় এবং কোদাল, খুরপি প্রভৃতি চাষের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি নাগাভূমির এই ধাপে ধাপে চাষে ধান প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন হইতেছে।



নাগাভূমির ঢেউখেলান পাহাড়ে পাহাড়ে নানা জাতির বাস। প্রতিটি নাগা গোষ্ঠীর সামাজিক অনুশাসন ও রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রায় সহস্রাধিক নাগা গ্রামগুলি ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার ফুটের উচ্চে অবস্থিত। নাগারা পাহাড়ের উপর গ্রাম নির্মাণ করিয়া বাস করে। কোহিমা জেলায় **আংগামী, চেকসাং, জেলিয়াং, কুকি ও রেংগমা** প্রধানত বাস করে। আংগামী ও চেকসাংরা পাহাড়ের গা কাটিয়া ধাপে ধাপে

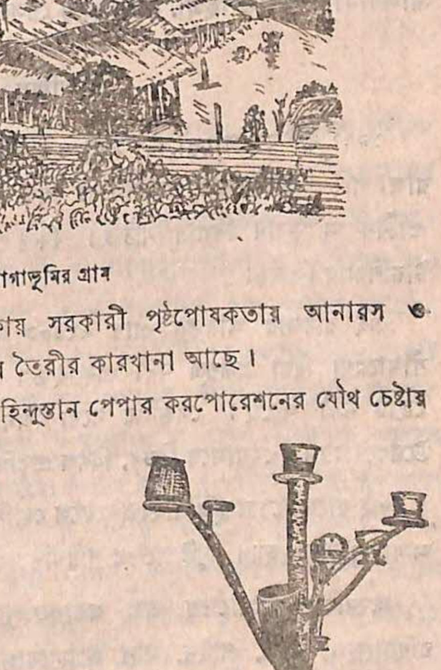
চাষ করে। মোককচং জেলায়, **আও**, **লোঠা**, **সেমা** ও কিছু কিছু **রেংগমা** বাস করে। তুয়েনসাং জেলায় **কোনিয়াক, চ্যাং, সাগটম, ফোম ইমচুংরীদের** বাস। সাধারণত এই গোষ্ঠীগুলি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর।



নাগাভূমির গ্রাম

নাগাভূমির **চাংকি** উপত্যকায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আনারস ও কমলালেবুর রস, ও পিয়ারার জেলি তৈরীর কারখানা আছে।

সম্প্রতি নাগাভূমি সরকার ও হিন্দুস্তান পেপার করপোরেশনের যৌথ চেষ্টায় **টুলিতে** একটি কাগজের কারখানা গড়িয়া তোলা হইতেছে। এই স্থানটি **আমগুড়ি** রেলওয়ে স্টেশনের ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এছাড়া **চিজিট** অঞ্চলে একটি প্লাইউড-এর কারখানা চালু হইয়াছে। **ডিমাপুরের** সন্নিকটে একটি **চিনির কল** গড়িয়া উঠিতেছে।



ঘর সাজানোর কাঠের কাজ

নাগাভূমিতে বাড়ীঘর সাজানোর জন্য নানারকম কাঠের কাজ দেখা যায়। কুটির শিল্পের মধ্যে বাঁশ ও বেতের কাজ এবং-তাঁত উল্লেখযোগ্য। নাগাদের পরনের রঙীন কাপড় বা চাদর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্প্রতি নাগাভূমির নানাস্থানে খনিজ বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে **ম্যালাক্ সুরাং**-এ কয়লা। কিন্তু ঐ কয়লা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়। তুয়েনসাং ও কোহিমা জেলায় **কিপ্ ব্রিও মেলুরিতে** চুনাপাথরের খনি আছে। **পুংরো** অঞ্চলে **ক্রোমাইট** পাওয়া যায়। এই সকল খনিগুলির সদ্ব্যবহার হইলে নানাপ্রকার শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিবে এবং দেশ সমৃদ্ধ হইবে। নাগাভূমির রাজধানী হইল **কোহিমা**, **ডিমাপুরে** রেলস্টেশন ও **বিমান ঘাঁটি** আছে।

মেঘালয়

১৯৭২ খৃস্টাব্দে **গারো**, **খাসিয়া** ও **জয়ন্তিয়া** পাহাড় লইয়া পৃথক **মেঘালয়** রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। মেঘালয়ের অর্থ হইল মেঘের ঘর। এই অঞ্চলটি প্রাচীন আর্কিয়ান শিলায় গঠিত। কিন্তু শিলং-এর আশেপাশে রহিয়াছে টারশিয়ারি শিলা।

এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ২২৪৮৯ বর্গ কিলোমিটার। এই রাজ্যের সীমারেখা দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদী প্রবাহিত। মেঘালয়ে আরও কয়েকটি ছোট ছোট নদী আছে। সেগুলির মধ্যে জিনারি, জিঞ্জিরাম, রুংডি, ও কাহি উল্লেখযোগ্য। মেঘালয়ে বিডন, বিশপ প্রভৃতি কয়েকটি জলপ্রপাত আছে।

এই রাজ্যে চেরাপুঞ্জি পাহাড় অঞ্চলে মৌসিনরামে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৎসরে প্রায় ১২৭০ সেন্টিমিটার।

অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য স্বভাবজ উদ্ভিদ পাহাড়ের গায়ে ছড়াইয়া রহিয়াছে। শাল, পাইন, বাঁশ উল্লেখযোগ্য গাছ। যথেষ্ট পরিমাণে কাঠ থাকার ফলে নানা প্রকার শিল্পকাজ দেখা যায়। বিশেষ ভাবে ঘরদোর তৈয়ারীর নানা সরঞ্জাম এই সকল কাঠ হইতে পাওয়া যায়। আর নিত্য নিয়মিত জ্বালানি কাঠ এই অরণ্য হইতে সংগৃহীত হয়। জংগলে অনেক জীবজন্তু আছে। তাহার মধ্যে বাঘ, ভালুক, বাইসন, বন্য বরাহ, হরিণ, হাতী এবং চিতাবাঘ উল্লেখযোগ্য।

এই অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী **গারো** ও **খাসিয়া**। ইহাদের মধ্যে

খৃস্টান ধর্মের প্রভাব বেশী। যাহারা খৃস্টান নয় তাহাদিগকে সাংসারিক বলিয়া অভিহিত করা হয়। শিলং মেঘালয়ের রাজধানী। ইহা এখনও আসামের রাজধানী হিসাবে পরিগণিত। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ঝুম চাষ করে। আর পাহাড়ের গায়ে নানারকম কলা, পেয়ারা, কমলা, আনারস উৎপন্ন হয়। গারো পাহাড়ের আনারস ভারতের নানাস্থানে পাঠানো হয়। ইহা ছাড়া ঐ অঞ্চলে তূলার চাষ হয়। ঐ তূলা হইতে নগদ টাকা আসে। শিলং অঞ্চল সাধারণত বার্ষিকগড় ১০০" বৃষ্টিপাত হয় ফলে এই অঞ্চলে বিস্তীর্ণ অরণ্য।

জন-জীবন

পাহাড়-পর্বতের পাদদেশে প্রকৃতি নির্ভর উপজাতি গোষ্ঠীগুলির জীবন কৃষিকার্যকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে এই কৃষির মাধ্যমে উৎপাদনের প্রাচুর্য নাই বলিয়া গোষ্ঠীগুলি কোন রকম নিজ প্রয়োজন মিটাইয়া লয়। সেইজন্য কৃষিকার্যের মধ্যে উদ্দামতা নাই। আবার নগদ টাকা পাইবার জন্য তাহারা কমলা, তেজপাতা, আলু, আখ ইত্যাদির চাষ করিয়া থাকে। ঝুমচাষের মাধ্যমে এক গ্রাম-পরিবার বা 'কম্যুনিটি' (Community) বোধ দেখা যায়। কেন না যে কোন একজন লোকের পক্ষে ঝুমচাষের ক্ষেতকে তৈয়ার করা সম্ভব নয়। সুতরাং সংঘবদ্ধতা বা যৌথ জীবন এই অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন গ্রামবাসীদের মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আবার এই ঝুমচাষের জন্য বিভিন্ন রকম শ্রমের তারতম্য বা বিভাগ আছে। পুরুষ, নারী, শিশু প্রত্যেকেই নানাভাবে ক্ষেতে কাজ করে। আবার চাষের সময় ঝুমচাষের ক্ষেতে অস্থায়ী ঘরবাড়ী তৈয়ারী হয়। তাহাতে কৃষকেরা থাকে, পাহারা দেয়। আবার ক্ষেত হইতে ফসল উঠাইয়া লইলে তাদের স্থায়ী গ্রামে ফিরিয়া যায়। ঐ সময় হইতে আবার নানা রকম উৎসব চলিতে থাকে। সম্প্রতি মেঘালয়ে নদীর জল আটকাইয়া পাম্পের সাহায্যে যাহাতে ফসল ফলান যায় তাহার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। অনেক অনাবাদী জমি আবাদ করা সম্ভব হইবে আবার কোন কোন জমি একবারের বেশী চাষ করা সম্ভব হইবে।

আবার মেঘালয়ে খনিজ দ্রব্যের মধ্যে চুনা পাথর, সিল্লিমিনাইট, বেলেপাথর

ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। এই সব খনিজ পদার্থ বাহিরে রপ্তানি হয় ও দেশের বাহির হইতে অর্থ আসে।

কৃষি-ব্যতিরেকে প্রকৃতি-নির্ভর মানুষগুলি অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটায়। সুতরাং অরণ্যের প্রভাব তাহাদের জীবনে নানাভাবে প্রতিফলিত। তুরা, হাপিভালী, ডাউকি প্রভৃতি কতকগুলি ছোট শহর আছে। উপজাতি অধ্যুষিত গারো এবং খাসিয়ারা মাতৃকেন্দ্রিক। মাতৃকেন্দ্রিক উপজাতিদের সমাজ-ব্যবস্থা অন্য রকম। কেন না বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর বাপের বাড়ীতে স্থায়ীভাবে থাকে। বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হয় মেয়েরা। অবশ্য খৃস্টান হওয়ার পর এই সনাতন জীবনধারার অনেক পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মণিপুর

পূর্ব ভারতীয় পার্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে মণিপুর অন্যতম। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে মণিপুর গভর্নর শাসিত রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ইতিপূর্বে মণিপুর কেন্দ্রীয় রাজ্য হিসাবে পরিগণিত ছিল। এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ২২,৩৫৬ বর্গ কিলোমিটার। এই রাজ্যের উত্তরে নাগাভূমি, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ ও মিজোরাম আর পশ্চিমে রহিয়াছে আসাম রাজ্য। এই রাজ্যে নদীগুলির মধ্যে বরাক ও মণিপুর অন্যতম। মণিপুর অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মণিপুরের অরণ্যভূমিতে পাইন, বাট প্রভৃতি গাছ আছে। ইহা ছাড়া বাঁশ ও বেতের জংগল আছে। স্থানীয় অধিবাসী এই অরণ্যের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকে। আবার অরণ্যভূমিতে নানাপ্রকার জীবজন্তু আছে, যেমন, বাঘ, চিতাবাঘ, বন্যবরাহ, হরিণ প্রভৃতি। আর নানাপ্রকার সাপও দেখিতে পাওয়া যায়। মণিপুর অঞ্চলে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি, জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির।

মণিপুরের অধিবাসীদের মধ্যে পুরাতন কুকি ও নাগা সম্প্রদায়ের লোক আছে। কুকিদের নানা গোষ্ঠী কোম কুকি, পুরুম কুকী, আইমল কুকি প্রভৃতি প্রধান উপজাতি গোষ্ঠীর লোক আছে। তাহাদের অর্থনৈতিক জীবন কৃষিকার্যকে কেন্দ্র করিয়া। ইহাদের অনেকে **ঝুম** চাষ করিত অর্থাৎ

যৌথভাবে অরণ্য পরিষ্কার করিয়া চাষবাস করিতে অভ্যস্ত। ইহাদের মধ্যে এবং স্থানীয় অন্যান্য অধিবাসীদের জীবনে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

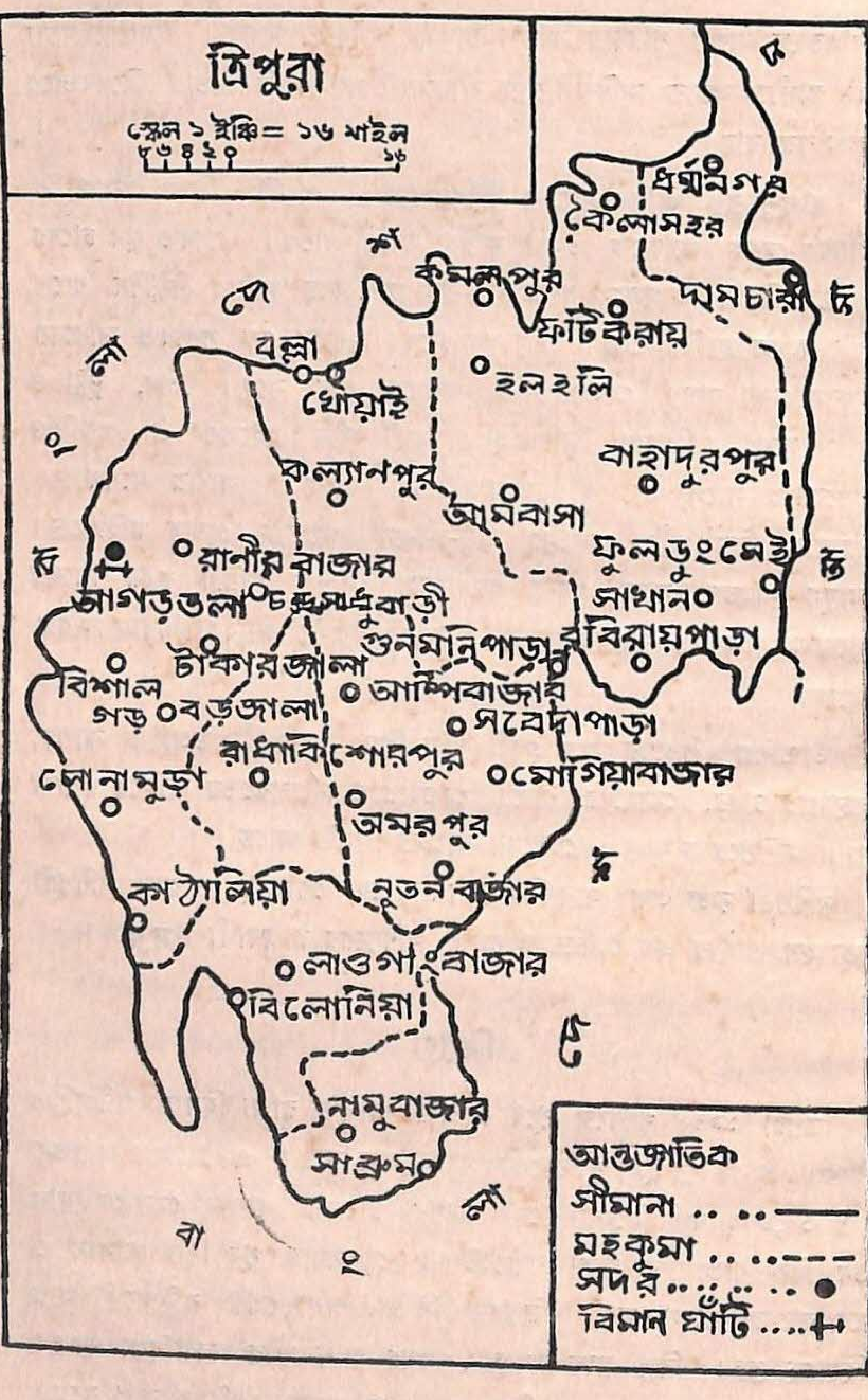
মণিপুরের অধিবাসীদের জীবনধারা ঃ প্রকৃতি নির্ভর উপজাতি গোষ্ঠীর লোক অরণ্যকে কেন্দ্র করিয়া বাঁচিয়া থাকে। প্রথমত ঝুম চাষের মাধ্যমে কিছুটা জংগলকে পরিষ্কার করিয়া চাষ করে আবার কিছুদিন বাদে সেই জংগল ছাড়িয়া দেয়। এই ঝুম চাষের মাধ্যমে এক সমবেত জীবনের উচ্ছ্বাস দেখা যায়। কেবল কৃষির মাধ্যমে ধান নহে। গম, ভুট্টা ও আখ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মাটি কঠিন হইলেও ঐ প্রকৃতিও পরিবেশের সংগে খাপ খাওয়াইয়া বাঁচিয়া থাকে। আবার অপেক্ষাকৃত অরণ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলের জন-জীবনে অরণ্যের প্রভাব রহিয়াছে। ফলমূল আহরণ, নানা প্রকার অরণ্যসম্পদ সংগ্রহ করিয়া কুটির শিল্পের কাজে লাগান হয়—যাহার মাধ্যমে বহু অধিবাসী জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

তাঁতশিল্প মণিপুরের আর একটি কুটির শিল্প। মণিপুরী ডিজাইন কাপড়, বিছানার চাদর, মেয়েদের গায়ে দেওয়ার স্কার্ফ ভারতের বাহিরে রপ্তানি হয়। মণিপুরে চামড়া ও রেশমের কাজের খ্যাতি আছে।

মণিপুরী নৃত্য এক আকর্ষণীয় নৃত্য। যে পোশাক পরিয়া মণিপুরী নৃত্য হয় তাহার এক বৈচিত্র্য আছে। মণিপুরের রাজধানী **ইম্‌ফল**।

ত্রিপুরা

ত্রিপুরা ১৯৭২ খৃস্টাব্দে পূর্বে কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হইত। ইহার পর ইহা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ১০,৪৭৭ বর্গ কিলোমিটার। ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থান এমন যে ইহার তিন দিক বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। কেবলমাত্র পূর্ব দিক আসাম ও মিজোরামের সংগে যুক্ত। ত্রিপুরায় বিভিন্ন পাহাড়শ্রেণী রহিয়াছে আর রহিয়াছে হ্রদ। কিছু অংশ সমভূমি, অপর অংশ নদীর অববাহিকা অঞ্চল। ত্রিপুরার এই পার্বত্য অঞ্চল, অগভীর অরণ্য ও হ্রদ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দুইটি পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি হইল উপত্যকা।

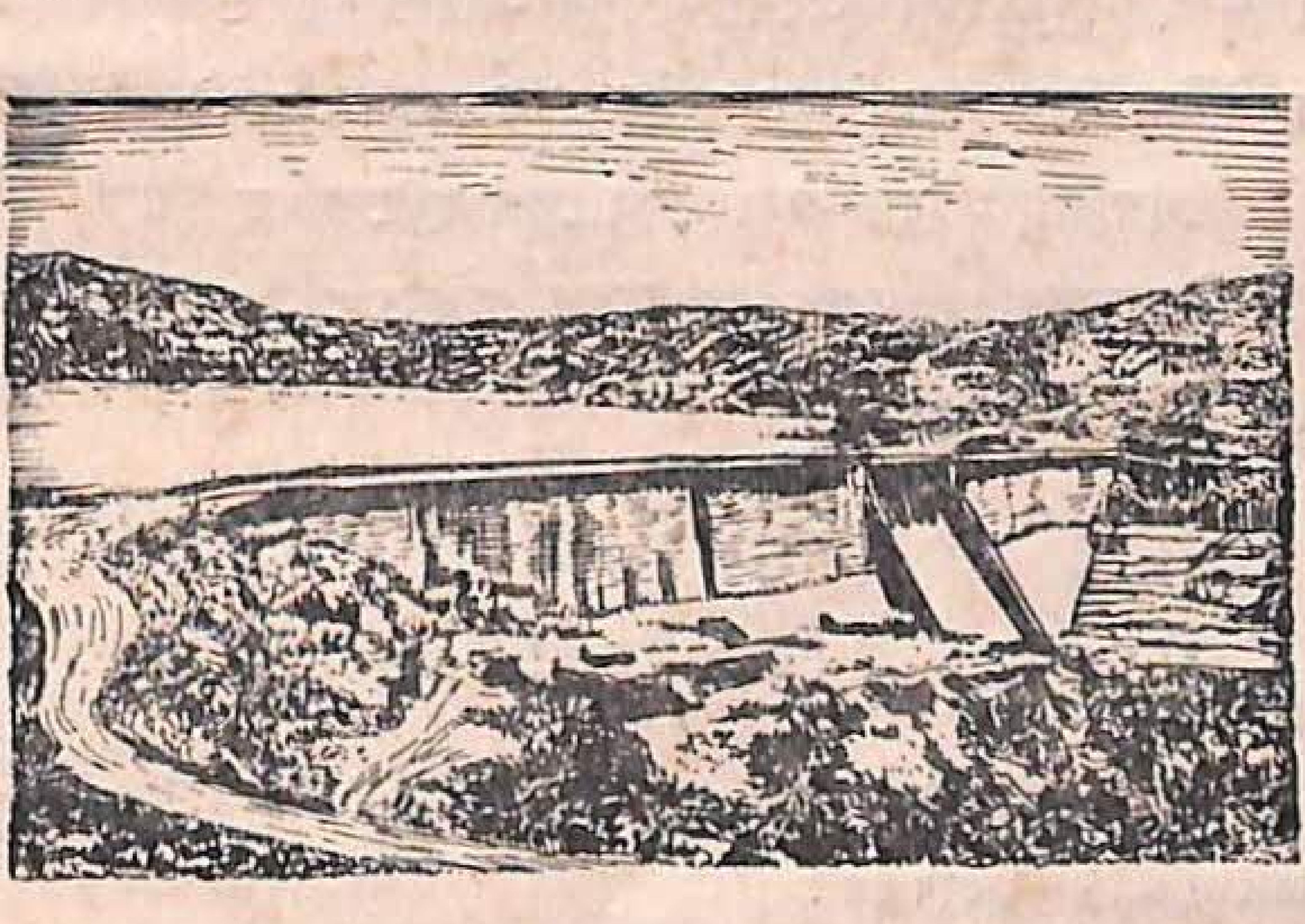

ত্রিপুরা
স্কেল ১ ইঞ্চি = ১৬ মাইল
ধর্মনগর
কৈলাসহর
কমলপুর
দামছড়া
ফটিকরায়
হলহলি
বল্লা
খোয়াই
কল্যাণপুর
আমবাসা
বাহাদুরপুর
ফুলডুংসেই
সাখান
রাণীর বাজার
আগরতলা
চন্দ্রসাধুবাড়ী
গুনমানিপাড়া
রবিরায়পাড়া
টাকারজলা
বিশালগড়
বড়জালা
আম্পিবাজার
সবেদাপাড়া
রাধাকিশোরপুর
মোগিয়াবাজার
সোনামুড়া
অমরপুর
কাঠালিয়া
নূতন বাজার
লাওগাং বাজার
বিলোনিয়া
নামুবাজার
সাব্রুম
আন্তর্জাতিক সীমানা
মহকুমা
সদর
বিমান ঘাঁটি

উপত্যকায় জনবসতি অধিক। ত্রিপুরার নদীগুলির মধ্যে হাওড়া, ধলাই, লাংয়াই, জুরি প্রভৃতি অন্যতম।

ত্রিপুরার জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ। গ্রীষ্মে কিছু গরম অনুভূত হয় আবার অন্য দিকে শীতকালেও বেশ শীতের প্রকোপ আছে। মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে মে হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়।

ত্রিপুরার অধিবাসীদের মধ্যে ত্রিপুরীরা প্রধান। ইহাদের অনেক গোষ্ঠী আছে। অনেকের বিশ্বাস ত্রিপুরার উপজাতি গোষ্ঠীগুলির সহিত ত্রিপুরীদের দৈহিক মিল আছে। উপজাতিদের মধ্যে রিয়াং, চাক্‌মা, জামাতিয়া, কুকি, লুসাই প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের সমাজের কাঠামো যেমন বিচিত্র, তেমনি আচার অনুষ্ঠান বা অন্যান্য উৎসবগুলিও অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ।

পার্বত্য ও হ্রদপূর্ণ এই রাজ্যটিতে স্বভাবজ অরণ্য যথেষ্ট। এই অরণ্যে শাল, সেগুন, ছাতিম, মেহগিনি, বেত, বাঁশ হইল মূল্যবান কাঠ। বাঁশ ও বেতের কাজ প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি নানাস্থানে পাট চাষ বাড়িয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যে নানাবিধ ফল, বিশেষভাবে লেবু, পেয়ারা, আনারস, লিচু যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া বাহিরে রপ্তানি হয়। আসামের মধ্য দিয়া স্থলপথে



পাহাড়ী হ্রদ

যাতায়াত করা যায়। পাট, আখ হইতে নগদ টাকা আসে। পাট ও চিনির কল গড়িয়া উঠিতেছে। আগরতলায় একটি বিমান ঘাঁটি আছে। আগরতলা এই রাজ্যের রাজধানী। সম্প্রতি আগরতলার নিকট **বরমুড়াতে পেট্রোলিয়মের** সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া এখানে রবারের কারখানা আছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের অসুবিধা ও নানাভাবে প্রাকৃতিক বাধা থাকার জন্য

ত্রিপুরায় দ্রুত শিল্প ব্যবস্থা সম্ভব হইতেছে না। অমরপুর মহকুমায় **ডম্বুরে** গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়া **জল-বিদ্যুৎ** উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রচেষ্টা কার্যকরী হইলে ত্রিপুরায় দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটিবে। ত্রিপুরার রাজাদের প্রাচীন রাজধানী ছিল **উদয়পুর, কৈলাসশহর, বিলোনিয়া** প্রভৃতি কয়েকটি শহর আছে।

ত্রিপুরার জন-জীবন

ত্রিপুরা রাজ্যে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। অধিবাসীদের বেশীর ভাগ কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। ধান প্রধান কৃষিজ শস্য। ইহা ছাড়া ঐ অঞ্চলে ডাল-কলাই নানাবিধ তৈল বীজ, পাট, মকাই ইত্যাদি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রধান অধিবাসীরা বৎসরের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়ার সংগে সংগতি রাখিয়া কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করে। তাহাতে কাজের রকমফের আছে।

ত্রিপুরায় চা শিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। বহুলোক চা শিল্পে নিযুক্ত। চা শিল্পে নিযুক্ত লোকজনের জীবন যাত্রার ধরনও পৃথক। মোটকথা জন-জীবনের বিভিন্ন দিকে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

ভারত বিভাগের পর হইতে এবং বাংলাদেশ হইতে বহু উদ্বাস্তু ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়া বসবাস করিতেছেন। ফলে তাহাদের সহিত মেলামেশার ফলে জীবন যাত্রায় নানা পরিবর্তন ঘটিতেছে।

অনুশীলনী

১। ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির নাম কী?
২। নাগারাজ্যে কী রকম চাষ হয়?
৩। নাগারাজ্যের প্রধান অধিবাসী কাহারা? তাহাদের সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
৪। নাগারাজ্যে খনিজ সম্পদ কী কী আছে?
৫। মেঘালয় রাজ্য সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
৬। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন্ শিল্প প্রধান?
৭। জন-জীবনের বর্ণনা দাও:
মেঘালয়, মণিপুর ও ত্রিপুরা।